অসাধারণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

মিত্রালয়, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মানসী প্রেস, ৭৩ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

স্বনামখ্যাত বন্ধু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

ত্রিশ বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালিলাগানো শাড়ী, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ব'লিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চান?

—বাবু, এ কে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি? মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দু'মাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন।···বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সবে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলে- হুঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে?

পুরুষটি এবার ক্ষীণস্বরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্য্যের স্বরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব থ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিন মাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর

কি কিছু ঠিক থাকে ? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন ?

—তা বাবু চার পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন···মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল তুমি তো সব জানো কিনা! চুপ করো। না বাবু, ছ'বছর হয়ে গেল। আমার হাড মাস ভাজা করে খেলে ওই মিন্সে। কি জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয় তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার।

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ী কোথায় ?

মেয়েটি বলিল—বাড়ী এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি ?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি এই ওনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী, ফেলতে তো পারিনে। আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুদ বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তার বাবুর কাছে নিয়ে যাই —একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে ?

মেয়েটি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে! ও করবে কাজ ? সেদিন পূবের সুয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না ?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু, কাজ আমি করিনে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু।

মেয়েটি বলিল—তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু শুনুন তবে বলি। কষ্ট দুক্ষুর বার্ত্তা ও কি জানে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসংবরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্রস্বরে বলিল—তা যা বল্লে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি দ্যায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারিনে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারিনে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বল্লে না?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভাল ধাই! তা যে বাড়ী যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমায় চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কি জানো ও-সবের। বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালোই। এখন আপনাদের এখানে হাঁসপাতাল হয়েছে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু'মণ ধান ভানলি পাঁচ-কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে, আর তেমন খাটতি পারিনে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বল্লে না?

—হ্যাঁ বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে? সে তো অনেক দূর।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ কর?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানেব জমি। বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁটি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারিবে, নৌকা ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন? ওর রোগ সারবে? সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করছি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে একথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন

হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকাভাড়া জোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ড কিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে!

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পাববে?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো কবি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদেব সঙ্গে রাস্তায় বাহিব হইয়া পডিলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইযা দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীব প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিযে। বহু কষ্টে পডিচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আব চালাতি পাবচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আব ন' হয় আট আনা পয়সা দেবে—তাই নেবো। আমাব খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইযের মত। তা বাবু আমি বাত্তিরি আঁতুড়ে থাকবো, সেক তাপ কববো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমাব বাসা। আর দিন আটেক পরে আমাব বাসাতে দরকার হবে ধাইযেব। চলো আমার সঙ্গে, দেখিযে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো। পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায ছাযায বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়ীতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাডীতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাডাগাঁয়েব অশিক্ষিতা ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ মেয়েটি দেখিতে ভালো এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দু'জনে চলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়ীতে হোলো না?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্ত্তা আগেই হয়ে গিয়েচে কি না? তাই—

—যাক্ গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়? লেখাপড়া জান নাকি?

পুরুষটি বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ী?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে অমোকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের স্বরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে না, চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে বেলাডা। তা ও বই পড়ে বোজবার মত অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ী ছেল ধরমপুকুর। শূয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভালো। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দ্দশা হবে কেন ওর বাবু? ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল ?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—অপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাশ করেছিলে ?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাশ করে দুটাকা ইস্কলাসি পেয়েল।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি!

পুরুষটি তখনও ঝোক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমাব সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হোল না ওর। মামারাও মরে হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যাবে বলে—বানরেব গলায় মুক্তোর মালা। সব অদেষ্টের ফল আর কি। আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে পজ্জন্ত ওই আমারে খেতি দ্য.য। আমাব এই চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাচ্চে। আজকাল তেমন রোজগার নেই ওর—পেট ভরে দুটো খেতিও পায না – আমারে বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার! বাবুব সামনে ওই সব কথা ? চলো বাড়ী তুমি – ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ!…মুরোদের আবার ব্যাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার ?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম—কেন, ও তো ভালোই বলচে। ওর যা ভাল লেগেচে, ভাল বলবে না ?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেচে ওকে ?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয়নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্চে। ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মণ করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড়ে ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর 'দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়ীতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ জোগাড় করা আমার কর্ম্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর সুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থ-বাড়ীতে থাকে না, যাহা আছে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে সুরু করিল ইংাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধোলঙ্গ, অনশনক্লিষ্ট, দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্য্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম।

কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্ণ স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকো ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথে ঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসেনি। আর আসবে কি, এই তো কাণ্ড। ওষুধের দাম দিতে পারে না—ক'শিশি ওষুধের দাম এখনো বাকি। অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানার খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে।

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায়?

—ওই পুরানো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম। গিয়া মনে হইল না আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরানো পোষ্টাফিসের পিছনে যেখানে গবর্ণমেণ্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বটতলায় এক ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া বৌটির খোঁড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে এত রুগ্ণ। মেয়েটি তার

পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউণ্ডের টিউবওয়েল হইতে শতছিন্ন শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু'ঢোক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন?

মেয়েটি বাঁ হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি?

—কেন মালসাটা?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারেনি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে? এককাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে করে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

নদীর ধারের বাড়ি

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে। দু'নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দোতলার ছ'টি ঘরে ছ'টি পরিবারের বাস। কলতলায় দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওর মধ্যে একটু দেখতে ভালো, বয়েস ত্রিশের সামান্য ওপরে, দু'এক বছর ওপরে। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বল্লে --ফিরবে কখন ?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। যদুনাথ একটা সওদাগরি আফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরী করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না; দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বল্লে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ি ছ্যাখো, বুঝলে ?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ি মিলচে কই ? খুঁজতে কি কম করচি ?

—এ বাড়িতে আর টেকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল ?

—কবে না হয় ? বিশ্বেস গিন্নির সঙ্গে মতির মা'র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রাম বাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে ?

—তা আবার কি নিয়ে? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরুমি আর ভালো লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল; ছেলে দুটিই বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে ব'সে দুটি আহার করতে পারে। আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্চে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন'বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জন বাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালবাসে। কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে—কাকিমা কি রাঁধলে?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেননি কাকাবাবু?

—নাঃ। দুটাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কেনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকিমা। আপনারা রেশন আনেন নি?

—বুধবার আসবে রেশন। এখনো আনা হয়নি। তোমার কাকা যেতে সময় পান নি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নিরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়, এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকলে! এই গুমট গরমে স্নিগ্ধ জলে

স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বল্লে—ও দিদি, কি হচ্চে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে! আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো!

—রেশন এসেচে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরাণীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুণ খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নি দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দ্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দ্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্চে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে, কী হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বল্লে চিনি দিতে হবে, 'না' বল্লে আর রক্ষে আছে? কোন্ কালে এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে বরিশালের টানে—আমরা কি কোনদিন কিছু কাউকে দিই না কি! সময়ে অসময়ে নুন রে তেল রে—তা নিয়ে মনে

থাকবে ক্যানো? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি —আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না। তখন যেন— ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আইঢাই করে গরমে। আজ ন' বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিত, ভালো বল্লেও এ বাড়িতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললে, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায়! শশীবাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয়; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে— যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহোলে দোতলা বাড়ি আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়— ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বল্লে—দিদি, কি পাগলের মত বকচেন? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন? কেন আমি তা ফেলতে দেবো?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু। তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে?

—তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্য্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এরপর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দু'পক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে। ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আফিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু'ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।··

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্তত মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে?···

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম— ল্যাংড়া আ-আ-ম—। বৃষ্টি এখনও নামেনি এবার। জৈষ্ঠ্য মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বল্লে— দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা?

শ্যামলী বল্লে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না ?

—কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোন আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েচে ? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে একনম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আফিসের রেশন বেচে। সে কী ঝাঁজওয়ালা তেল। মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভালো তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচ সিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের ফি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে নেবে দশ পলা। এক সঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে। দেবো না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল ? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি মিনতি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচেই তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুশি হয় হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁট-

মঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে। তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারিনে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে। দিই নি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়িটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বল্লেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড় লোকের জমিদারী কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেচে। জমিদারি বিক্রি হয়ে গিয়েচে, কাছারি বাড়িটাও ওরা আলাদা বিক্রি করবে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারিবাড়ির সংলগ্ন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ি, তাতে আম কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ির সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে। তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন, বাড়ির মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো, তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন

হাজার টাকা হোলে বাড়িটা পাওয়া যায়—জমিশুদ্ধু—কিনবো? প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে?

—পাড়াগাঁ। কে সেখান খদ্দের হচ্চে? যদ্দূর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

— টাকা দেবে কোথা থেকে?

—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখেনি। বাপের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্য্যন্ত উঠে এসে কলকাতা বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়!

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বল্লে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

- কেন, সেখানে।

—আপিস?

—চাকুরী ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভালো লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরাণী হবে? তার চেয়ে ভালো কাজ

ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস ক'রে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভালো কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙীন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা বিছানায় আধ-জাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা।

দিনপনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বল্লেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বল্লেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বল্লেন, বাড়ি রেজেষ্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়িতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবদ্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে ওরা বেলা দশটার সময় নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ি। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বল্লে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়িটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি? সর্ব্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা। ক্রমে আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বল্লে—এই যে বাবু বাড়ির সামনে এসে গিয়েচে গাড়ি। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বল্লেন—না দেখে বাড়ি কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ি কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়িতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—হ্যাঁগো বাড়ি কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধূলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বল্লে—মা ঠাকরুন, বাড়িতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ি দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ি খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর

সামনেই যে বাড়িটা পড়লো, সেটা দেখে ও আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ি তাদের। এমন বাড়ি এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে রং করা সবুজ রংয়ের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ি দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়িটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়িটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—ওগো ছাখো, এসে ছাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হোল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে! ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ির কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বল্লেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ির কথা বহুবার জিগ্যেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ি বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করলেন। তেতালা বাড়ি, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফল পাকড়ের গাছ। ছাখবেন বাড়ির মত বাড়ি।

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়িটা দেখে মনে হোল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়িটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে, অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হল্‌দে রংয়ের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ি ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বল্লে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে

পড়িচি এই অবেলায়। বেন্‌বেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ি ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো? আসুন, মা ঠাকরুন, আসুন বাবা—

শ্যামলী বল্লে—তোমার নাম মুক্তোর মা?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা। নামটাই আছে বজায়, যার জন্তি নাম সে আর নেই। তা হ'লি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যমলীর ওসব কথা ভালো লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়িটার ওপরে নিচে সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা। কী মনে করবে মুক্তোর মা।

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বল্লে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড়। ছ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে?

বড মেয়ে ডলি বল্লে—কতগুলো জানলা ছ্যাখো মা রান্নাঘরে!

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠলো। শ্যামলী বল্লে—ওগো, ছ্যাখো কি সুন্দর মেজে। কাঁচের সার্সি বসানো জানালা!

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বল্লে—কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট্ট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা?

যদুবাবু বল্লেন—ও ঝিঙের ফুল। বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে

কিনা! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওগো, ছাখো ইদিকে এসে! কি ফাঁকা!

শ্যামলী বল্লে—তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানলা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এলো। এ যে রূপকথার রাজবাড়ি তার কাছে, সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বৌ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়িঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বল্লে—বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে ৮টা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্চে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যদুবাবু বল্লেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মত জিনিস। বাড়ির মত বাড়ি। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো। এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও জিনিসপত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বল্লে—তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁটাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি ফুলগাছ, দুঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকোল গাছ। বাবুরা নিজের হাতে সব লাগিয়েছিল থাকবে বলে। সখ করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ওবছরও ওই ছাখো একটা চাঁপাফুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্যামলীর দুঃখ হোল, এখন আর

কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি-পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বাললে। ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বল্লে—কি মা?

—জল আছে বাড়িতে?

—জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা তাই তুলতে পারিনি—

—সে কথা বলচিনে, বাড়িতে জল আছে? কুয়োটুয়ো—

—বাধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ি কোন ত্রুটি ছিল না মা, আগাগোড়া সান বাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

—তাতে জল তুলে রাখো নি?

—নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুব গিয়েচে! চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঁঠাগুলোতে। কি একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুরভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

—কি একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারাভরা আকাশ।

এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস--সব তাদের, তাদের নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যেই সত্যি কষ্ট হোল। বেচারী মতির মা। বেচারী শশীবাবুর বৌ। ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এত সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শীগগির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে—এসো চট করে—

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

— — — —

বিপদ

বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই? একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি যোল সতেরো বছরের মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক স্বরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম। এইবার চিনিলাম। রামচণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েচে দেখচি। শ্বশুর-বাড়ি কোথায়?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হলো?

—এই দু'বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ির মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি নোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের ছুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শ্বশুরবাড়ি ?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরী হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়'ছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউমাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউমাউ' কথাটি স্বষ্ঠু ভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে ছু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, ছু'বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ির অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া ছুটি আপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে। মেয়েটি মায়ের

ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ একবছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ির ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিগ্যেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল ?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর ? কি রকম চোর ?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুজ্যেবাড়ি রাখেনি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি কবে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই খাই—কেবল খাবো আর খাবো। ওর হাতীর খোরাক জোগাতে না পেরে মুখুজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওব মা ওকে দেখে না ?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতি। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো ? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোবে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির উপব আমার দযা হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারটে পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমাব বাড়িব সামনে হাউ হাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। ব্যাপার কি ? শুনিলাম মধু চক্রবর্ত্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা কবিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর, এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ; তখনই মধু চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা

গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ ?

—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।

—না, খুব অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা ওসব কি ? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ ফেরৎ দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনোদিন মধু চক্রবর্ত্তীর বাড়ি ভিক্ষে করিতে না যায়।

এই সময় আকাল সুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালাপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বোধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়। যেন মস্ত একটা সুসংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কি ?

—এই ! আপনাদের বাড়িও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি ?

হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে

হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছটাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও… ।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান্ কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্থ না। তাহোলে কি আর ঘরের বৌকে কেউ তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় নি। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড?

—কি?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকি-ও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা

পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্ত্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসব হইয়াছি, এমন সময়ে কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়!

বলিলাম—কে?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙীন কাপড পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বারে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাল—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বারে, ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সে জন্য সে গর্ব্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুন তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—আসুন না, দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবো না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন ?

—বাড়ি যাবো।

সে আবদারের সুরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াক খড ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারিধরণের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোষের ওপব সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির ওপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্-ঝক্ করিতেছে। মেজেতে একটা পুবনো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে-তামাকের মালসা, আরও কি কি।

হাজু গর্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয় ?

—সাড়ে সাত টাকা।

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন ? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচিনে। আমি এখুনি চলে যাবো।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো ? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন ? ওটা কেমন ? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে ; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।

সঙ্কল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়িতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায় ?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম—কোথাকার চা ?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস ?

—হুঁ দুটি বেলা চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারিনে, জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু !······

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউমাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হোলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উৎরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন ? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিলাম।

—কার হাতে দিয়ে দিলি ?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায় ?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো। সেখানে খেতে-পরতে পাচ্চে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে খেয়ে তো অছেদ্দা হোল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাই নি। এই এত বড় বড় এক একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন ? আমি গিয়ে আলুব দম আনাবো ? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সবলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্চি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো। অন্য লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মা'কে টাকা দিয়েচে কিনা, তার ঠিক কি ?

হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না পায় তা কি জানি।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই ? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে ?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস ?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা। চলি—

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল ?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা ?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার ?

জন্মদিন

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায় বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুলপুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেড-মাষ্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্কুলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় বাঁশ-বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মত। দেখতেন, এ দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে; সে জীবনে কলকাতায় তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জে, মোটর থাকবে, কলিং-বেল টিপলে উর্দ্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে। তখন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছিল অপূর্ব্ব রঙে রঙীন।

আজ তাঁর বয়েস একষট্টি। আজ একষট্টিতে পা দিলেন। লেক প্লেসের বাড়ীর, নতুন বাড়ীর তেতালায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠেই দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায় বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরশো বাহান্ন সাল। একষট্টি বছরে পড়লেন তিনি আজ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয়। দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ার ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগ-ডালে। মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো চা-পানের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মেয়ে সুমিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্চে, দুখানা খেয়ে যাও চায়ের সঙ্গে—

—নাঃ। ও কি মাখন ?. আজ-কাল মাখন বলে যা বিক্রি হয় ও-দিয়ে টোস্ট আমাদের ধাতে সয় না। তোরা খা—

বলে রায় বাহাদুর বেরিয়ে পড়েচেন।

খানিকটা এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরে রায় বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে

বসলেন। একখানা মিলিটারি বোট কিছু দূরে ভাসাতে চেষ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়চে। নাঃ, কোথাও যদি একটু শান্তি আছে।

একষট্টি হোল তা হোলে। যখন তিনি ষোল সতের বছরের ছেলে, তখন মনে আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হোত। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেল? নিজেকে খুব বেশি বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায় বাহাদুর। সে-দিনও তো ধর্ম্মতলার চুলকাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে? রায় বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেষ্টা করলেন। কাশী থেকে এসেচেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেসলির বাড়ীতে তাঁর শালাকে সে-বার চাকুরী জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দু'জনে একসঙ্গে সে-কালের সিটি কলেজে পড়েছিলেন, গণেশ সরকার লেসলির বাড়ী বড চাকরী করতো—এখন অবসর নিয়েচে। গণেশেরও বয়েস তো হোল ষাট-একষট্টি। দু'এক বছর কম বা দু'এক বছর বেশি। ওতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০ সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি? ভাবলে মনে হয়—সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায় বাহাদুর। বয়েস হোলে কি হবে, আর পাঁচ জন বুড়োর মত তিনি নন। এমন কি পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়ের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল রে? নিজের চেয়ে দু'এক বছর কম বয়সের লোককে বলেন—আরে একেবারে বুড়ো মেরে গেলে যে! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি।

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতেই নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচ জনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জ্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম-ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন।

—এই, কি দিচ্ছিস্ ও? দু'টো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস্। টাকার ভাঙানি নেই? ব্যাটারা সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল বাদাম নিলাম, বলে কি না টাকার ভাঙানি নেই! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেচে এই লেক। এই বেঞ্চিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জ্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়ীতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুমিতার ঘরে সুমিতার বন্ধু অলোকা ও ডাক্তার বাবুর নাতনি বেলা এসে গিয়েচে। অত গুজ্-গুজ্, ফুস্ ফুস্ কেন? সুমিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তার বাবুর ধিঙ্গী নাতনীটা। কমিউনিস্ট! সেদিন কোথা থেকে একটি গাদা ওই সব কমিউনিস্ট বই-পত্তর সুমিতার বিছানায়। আজকাল কি যে হচ্চে দেশে! মেয়েছেলেদের মধ্যেও কি না ওই সব!

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবন বাবু এসে জুটবে।

—এই যে রায় বাহাদুর। বসে আছেন নাকি? তামাক খাবেন না সকালবেলা? আজ কাগজ দেখেননি এখনো....ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন? ঘোল খাইয়ে ছাড়লে আমাদের বাবাজিদের। চা?...তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশি হোলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা

কথা। হরিশ মুখুজ্যে রোডের বাড়ীখানা একবার দেখবেন? আজই যেতে হয়। ওদের এটর্ণিরা বড্ড প্রেস্ করচে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন্ করি। ক'টার সময় স্থবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না—তবে বায়নার আগে রেজিষ্ট্রী আফিসগুলো একবার সার্চ্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা? এত বেলায়—আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখুজ্যে, ওর ভাইপোর একটা চাকরীর জন্যে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরী কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরও চেপে ধরে। বাড়ীর ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়। গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা—ভাগনে-জামাইয়ের বাড়ী তত্ত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফৈজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করচে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েচে। এত সকালে আর কোনো দিকে কোনো লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মত স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটা-ওঠা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর ঘণ্টা বাজাতো। তাঁর জন্যে টিফিনের সময় বাজার থেকে নিমকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ফ্রি পড়তো স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্যে একদিন স্কুল বন্ধ হোল। হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সান্যাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্চেন ইয়াংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার

পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন আমাদের। এ বয়েসে কোথায় যাচ্চি বলুন!

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করেনি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেচে। কিন্তু আজ মনে হচ্চে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয়নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েচে, আশাকে কেড়ে নিয়েচে. ফুরিয়ে গিয়েচেন তিনি, নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েচেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেননি—ঠকেচেন।

আজ তাঁর বয়স—থাক বয়সের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়সের কথা মনে না আনবার জন্যেই তিনি পার্কে বসা ছেড়ে দিয়েচেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা পার্ক আছে, ছোট পার্কটাতে লেক-পাড়ার পেনসনপ্রাপ্ত জজ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড় কেরাণী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিত ভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্ত্তা বলবে। অমুকের নাতনির বিয়ের কি হোল, অমুকের নাতনি এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েচে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাতনিতে নেমেচে। নাতনি সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে যেন কারো নাতনি কোনো দিন ম্যাট্রিক পাশ করেনি। সব নাতনিই অসাধারণ, সাধারণ নাতনি একটাও চোখে পড়েনি। নাতনির প্রসঙ্গের পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায় বসলেই মনে হয়—

“এবার দিন ফুরুলো
সমুঝে চলো
ইহকাল পরকাল হারিও না—”

কিংবা—“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর”

কিংবা—"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে"
ইত্যাদি। ··

দিন কতক গিয়ে তাই রায় বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, যেখানে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, শ্যাম-বনকুঞ্জ পাও রে। হরিৎবর্ণ দ্বীপটি জলের এক দিকে, কত সুগঠিত দেহ তরুণ কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে-যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্যে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোঁটে রং, খাঁকির আঁটসাট পোষাক পরনে। না, এখানে লাগে ভাল। যৌবনের হাওয়া বয় সর্ব্বদা!

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দেখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায় বাহাদুর, সেদিন কর্জন পার্কে এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বুইয়ের কাণ ঘেঁসে যাবে, জ্যোতিষী না বল্লেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতায় এত বড় বাড়ী করেও, ভি এইট্ ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্চে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসতো···সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা···ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতো নবীন নাপিত ··কত নির্জ্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা····

তখন ছিলেন গরীব স্কুল-মাষ্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল মাষ্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইনসিওরেন্সের কোম্পানী খুললেন নিজে, বড় আপিস হোল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হোতে লাগলো। দেশহিতকর কাজও দু'-চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েচে। ছেলেরা বলে—ভালো

গাড়ী কিনুন বাবা। একখানা মার্সেডিজ্ বেন্‌জ দেখে এলাম কাল—খরগোষের মত নিঃশব্দে চলে—কি ফোর্ড গাড়ীতে চড়বেন চিরদিন!

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশ্যি। তেলের অভাব ছিল কি?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্যে কলকাতার বড় লোকেরা হাঁ করে থাকে। বাড়ী বিক্রি থাকলেই রায় বাহাদুর কিনবেন। এটর্ণির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল বাড়ী থার্ড মর্টগেজ। প্রথম দুই বন্ধকী খতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ী কিনেচেন, জেদের বশবর্ত্তী হয়ে। দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন। এই লেক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ ষ্টোর রোডে, গড়িয়াহাটা অঞ্চলের অনেক বাড়ী তাঁর জমির ওপরে। এসব কাজে ঠকেচেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েচেন, রেজিষ্ট্রী আপিস অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল। মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক!

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। বড় ছেলে আপিস বেরোয়। ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না। মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েচে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেসও করে না অনেক সময়। কেবল গিন্নী এখনো পুরোনো দিনের সুর বজায় রেখেচেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নীর চলে না। মুখ নাড়া মুখ-ঝাড়া সব তাঁরই ওপরে। আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্দ্ধ বাতিল। সুন্দরী বড় পুত্রবধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্য্যে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। বাড়ীর ঝি-চাকর তার কথায় মরে-বাঁচে। বুড়ো-বুড়ীকে বড় কেউ একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। একষট্টি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন।

আজ গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মতই তিনি অনাবশ্যক। ওই রাতুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। পুরুত-গিরি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁর মেয়ে, নাম

নিরুপমা। সহরের তুলনায়—তাঁর বড় পুত্রবধূ প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না তবুও সে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী কিন্তু চমৎকার। বাড়ীতে আর কেউ থাকতো না পুরুত ঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়ো জলপাই গাছের তলায় দুপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হোত মাঝে মাঝে। ষোল বছরের সুশ্রী কিশোরী।

এক দিন নিরুপমা দুটি পাকা আতা দু'হাতে নিয়ে এসেছিল। হেসে বল্লে

—তুমি আতা খাও ?

—কেন খাবো না ?

—এই নেও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেবো না—

নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বল্‌লে—তবে কি ?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে—

—কি ?

—এই দেখিয়ে দিচ্ছি কি—সরে এসো—

—ধ্যেৎ—ভারি দুষ্টু তো !...

হাত ছাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মত চটুল গতিতে।

আর এক দিন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনে গ্রাম্য মাষ্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেচেন। খেতে বসেচেন ভাবী রায় বাহাদুর। পরিবেষণ করচে নিরুপমা, আরও পাঁচ-ছ' জন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেচে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মৃদু হেসে জানালা থেকে সরে গেল।

কালকার কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল—চল্লিশ বছর !

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টুমিব হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেতো কিন্তু গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায় বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কন্যাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায় বাহাদুর বিদেশী লোক, কেউ তাঁকে খবর দেওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল, না, কাঁদেনি?

শুধু এই সংবাদটা পাবার জন্যে রায় বাহাদুর কত চেষ্টা করেচেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারেনি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি।

কেই বা তাঁকে সংবাদ এনে দেবে?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে রায় বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। আর যাননি কোনো দিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের কথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

ওখান থেকে চলে আসবার পর তিনি কত বার ভেবেচেন, নিরু আজ কোথায় আছে? কেমন আছে? তাঁর জন্য নিরু কি ভেবেছিল?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয়নি। বিবাহ করেছিলেন বড় লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেন নি কোনো দিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন. মধ্যে দশ-বিশ বছর আর তেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জ্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূরে একটা নারকোল গাছের তলায় দাঁড়ালো। এ-দিকে ও-দিকে চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজচে। রায় বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে

অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েচে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, তিনি কই? মানে, মা লক্ষ্মীটি? এখনো আসেন না কেন?

আজ রায় বাহাদুরের ইচ্ছে হোল রাতুলপুর যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন। তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায়নি, যেন তিনি নব্য যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগচেন না আজ দু' বছর, যেন তাঁর বাত হয়নি সেবার আশ্বিন মাসে এবং বাতে কিছু দিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না—যেন রাতুলপুরের আম শিমুল জাম কাঁটালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আজও কিশোরী, তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলার সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়েচে। বেচারী!

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন। তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বল্লে—বাবা, রাত্রে কি খাবে? বৌদিদি বলে পাঠালেন—

রায় বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—কেন তিনি কি জানেন না আমি রাতে কি খাই? যাও পর্দ্দাটা তুলে দাও—

সুমিতা মুখের অপূর্ব্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায়বাহাদুরের দোতলার দক্ষিণমুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। সুমিতা জানালার পর্দ্দা খুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু 'গদি' আঁটা মিন্টি কৌচে বসে শেড দেওয়া লম্বা ডালের আলোতে রায় বাহাদুর অন্যমনস্ক ভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বৌমারা। তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধূ প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বল্লে—আমায় ডেকেচেন ?

— হ্যাঁ। আমি কি খাবো জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন ? আমি কি খাই ?

প্রতিমা জানে শ্বশুর বৃদ্ধ হয়ে ইদানীং খিট্‌খিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার সুরে বল্লে—না, সে জন্যে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্চেন না রাত্রে,বলেন সাবু করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে আনবো। ভালো মাগুর মাছ আছে কি না, তাই বলে পাঠালুম—

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলেনি। সবাই হযেচে—

—তা হলে দু'খানা লুচিই আনি গে ভেজে।

—হ্যাঁ, রাত তিনটে কোরো—

—দশ মিনিটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন না। আজ যদি—

প্রতিমা একটু পরেই রূপার থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা খুরো বসানো ছোট্ট রূপার বাটিতে মাঁছের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রায় বাহাদুর বল্লেন—তোমার শাশুড়ী কি করচেন ?

প্রতিমা সুললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বল্লে—মা ঠাকুরঘর থেকে বেরোননি ত ?

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো ?

রায় বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রেডিওটা সর্ব্বদা ঝং ঝং করলে আমার মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও ? ছোট বৌমা বুঝি ? বন্ধ করে দাও—ও নাকি সুরে গান সর্ব্বদা বরদাস্ত করতে পারিনে—

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেচে এ সংসার। শান্তি বলে

জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতি-মাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে—অন্তত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটার জন্যে। কতবার তিনি বারণ করেচেন—কিন্তু এ বাড়ীতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে? সাধে কি তিনি —শরীর কেমন ঝিম ঝিম করচে।

মধ্য-রাত্রে বড় পুত্রবধূ প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙালো। প্রতিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনলো দোতলায় শ্বশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঁঙানির শব্দ আসচে। সে তখুনি নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙালো। রায় বাহাদুর বিছানায় গুটিশুটি হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্চে। বড় ছেলে বাড়ী নেই। ছোট ছেলে ফোন করে দিলে ডাক্তারকে। তারপর নিজেও ছুটলো। খুব-হৈ-চৈ উঠলো। সবাই ঝুঁকে পড়লো বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটলো বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, পুত্রবধূর দল, নাতি-নাতনীরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায় বাহাদুর কি একটা বলচেন অস্পষ্ট গোঁঙানির মধ্যে—কেউ বুঝতে পারচে না। প্রতিমা কান পেতে ভাল করে শুনে বল্লে—নিরু কে? নিরু কার নাম? নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন।

ডাক্তার এসে বল্লে স্ট্রোক্ হয়েচে। সেবাশুশ্রূষা চললো, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হোল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রাকটারির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ক-কল্ করা গেল মেজ ছেলেকে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে।

সেদিন বেলা বারোটার আগে রায় বাহাদুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কাঠ-বিক্রী বুড়ো

আমি গাছ বিক্রী পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্য্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।

সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগলো, আমি সেটা পছন্দ করিনি।

একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে। বল্লাম—কি চাই ?

—বাবুর গাছ বিক্রী আছে, বিক্রী করবেন ?

—কি গাছ ?

—বাবুর বাড়ির পেছনে বিলিতি চট্‌কা আছে, বাগা'ন শিশু আছে, কলুচট্‌কা আছে।

লোকটার কথায় দক্ষিণের টান। বল্লাম—বাড়ি দক্ষিণে ?

—হ্যাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকি শ্রীপুর।

—গাছ কিনতে এসেচ নাকি ?

—বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনাদের এদিকে যদি বাগান টাগান পাওয়া যায় কিনবো।

বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেচি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বল্লাম না।

ও বল্লে—বাবু, গাছ বেচবেন ?

—না।

—ভালো দর দেবো বাবু।

—কি রকম দর শুনি ?

—তা বাবু আপনার বড় চট্‌কা গাছটা ত্রিশ টাকা দর দেবো।

আমি আশ্চর্য্য না হয়ে পারলাম না। এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছ'টাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠলো চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্ব্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চট্‌কা গাছের দাম চোদ্দ টাকা—ওই যথেষ্ট। আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কি !

চল্লিশ টাকা একটা চট্‌কা গাছের দাম এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনে নি। আমার বাগান-সংলগ্ন জমিতে এরকম চট্‌কা গাছ পাঁচ ছ'টা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখচি গাছ ক'টা বিক্রী করলে।

হঠাৎ মনে পড়লো নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোন এক বড় গাছতলায় প্লিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্ন-জগতের বাণী ভাসিয়ে আনতো, দৃশ্যমান জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্ন-জগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙীন ছবিতে নেপল্‌স উপসাগর তীরের এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চট্‌কা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম প্লিনির গাছ। টাকার জন্যে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেবো ?

লোকটাকে বল্লাম—না হে, ও গাছ বিক্রী হবে না।

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু' তিনটি বড় বড় বাগান কিনে তার সমস্ত আম গাছ কাটিয়ে গুঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগলো—ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্যে কিনে নিলে ওর কাছ থেকে। রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে—কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়-বাড়িতে

বর্ত্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায়-কাকাকে বলে সেই চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে আছে, আরও দু'টি সঙ্গী নিয়ে—চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুর-পাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের ত্তিকৃডিতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে—এজন্যে কাঠ-বিক্রী বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড খুব ঢালু, বড় বড় উলু ঘাসের বন, ভাঁট বন, পটুপটি গাছ—সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মত নেমে আসে অপরাহ্নের শান্তি।

কাঠ-বিক্রী বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।

আমি বলি—আর কতদিন আছো? গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।

আমি কি বলচি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কি তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বল্লে—না বাবু, কি আর এমন লাভই বা হবে, বড্ড খরচ পড়ে যাচ্ছে।

—কিসের খরচ?

—এই জন খরচ, কাটাই খরচ।

—কলকাতায় কি দর বিক্রী হে?

—আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট। মিথ্যে কথা বলবো না আপনার কাছে।

লোকটা আর কিছু ইংরেজী জানুক আর না জানুক কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওই করেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার

মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিদে। কুটিল, ধূর্ত্ত ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক একদিন খাওয়ায়। সুখদুঃখের দু'টো কথা বলে।

ক্রমে যত দেখি বুড়ো বড় বড় বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা জমে। পয়সার জন্যে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হোলে ভালো করে কথা বলিনে।

বুড়ো কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিন চার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে, গ্রামের সকলের নাম-ধাম ভালো করেই জেনে ফেলেচে। কে কোথায় কাজ করে, কত মাইনে পায়, কার কি রকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েচে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ি এসে সন্ধ্যার সময় বসে। তামাক খায়, প্রতিবেশীর মত গল্প করে। একদিন আমায় বল্লে—বাবু বুঝি বই লেখেন।

—হ্যাঁ।

—বই ছাপান কোথায়?

—কলকাতায়।

—কত খরচ পড়ে?

—পাঁচ ছ'শো, হাজার।

—তা বাবু আপনার মত আমাদের যদি হোত। চির জীবনটা কষ্ট করেই কাটলো। একটা ছেলে আছে, জমিদারি কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড় ভালবাসে। আবদুল না হ'লে কোন কাজ হবে না নায়েব বাবুর। সাইকলের পিছোনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলে। আর বছর পূজোর সময় বাড়ি এলো, তা ডিম এনলো চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি—

বুড়ো দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।

মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন লাভ হবে এবার ?

—কি জানি বাবু ?

—অনেক গাছ তো কাটলে।

—ওতে কি হয় বাবু—এখনো অনেক গাছ কাট্‌তি হবে।

—মোটা টাকা লাভ করবে এবার।

—দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয়। কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।

অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত। এমন কি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনলাম জ্বালানির জন্যে, তার দাম নিতেও এল না।

এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়লো। তার চাষবাস আছে, বাজারে ছোট একখানা ফলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরলো। আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে দেখাশুনো করি, দু'তিনটি ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের শহর থেকে কখনো ওষুধ, কখনো ডাক্তার, কখনো ফল, কখনো বরফ আনতে দিনে-রাতে চার পাঁচবার ছুটোছুটি করে। তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

চব্বিশ দিন জ্বরভোগের পর রোগী মারা গেল। গ্রামেব মেয়েরা চার পাঁচদিন ধরে ব্যস্ত রইল সদ্যোবিধবা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয়-আশয় কি হবে, চাষবাসের কি বন্দোবস্ত করা যায়।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলায়

একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার কাছে এত ভালো লাগলো যে শুধু যেন সেই ঘটনাটার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা।

বেলা আর নেই, ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরচি মাছ ধরে, ওদেরই বাড়ির পাশ দিয়ে। দেখি যে সেই কাঠ-বিক্রী বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কি কাজ করচে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলচে—সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হোল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকে চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হ'লি ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না -আপনার চোকি জল দেখ্‌লি বুক ফেটে যায়—

আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলচে।

এর চেয়ে কোনো অপূর্ব্বতর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারিনি।

সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতি-কাব্যের মত মনে হোল এর উদার আবেদন।

হারুণ-অল-রসিদের বিপদ

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ীর অবস্থা ভালো, যদিও সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষরপরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকদের জন্যেও লেখাপড়ার দরকার আছে বই কি। ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড় মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল, সোঁদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গরুতে। ওরা পরামাণিকদের বাগানের আম কুড়তে কুড়তে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাষ্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড় মজাই হোত। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্ত্তি বিপিন মাষ্টার ও তার হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুণ, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখেনি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্মফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাষ্টার ফুল ভালবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

হারুণ বল্লে—এই আবুল, এঁচড় পাড়বি ?

—কোথাকার রে ?

—চল্ না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।

—কি হবে এ চড় ? বিপনে মাষ্টারকে দিবি ?

—তাই চল্, যাবার সময়ে ওর বাড়িতে দু'খানা বড় দেখে দিয়ে যাই। মায়ের দায় বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি-থেকে উদ্ধার পাওয়ার এ পথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাষ্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দু'খানা বড় এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুণ উঠলো গাছে, আবুল রইল নিচে দাঁড়িয়ে। কোষ-ওয়ালা বড় এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয়নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাষ্টারের টিনের বাড়ীটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুণ ডাকলে—স্যর, স্যর—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন—আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচড় দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার স্বর মোলায়েম ক'রে বল্লেন—কিরে? এঁচড়? কোত্থেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এলো। বিপিন মাষ্টার ইস্কুলে গিয়েচেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকলো ক্লাসে দুরু দুরু বক্ষে।

বিপিন মাষ্টার কড়া সুরে হেঁকে বল্লেন—এই যে! হারুণ আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাষ্টার বল্লেন—দেরি কিসের?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কি ? এঁচড় ? কিসের এঁচড় ? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুণ ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে—আপনার বাড়ীতে এঁচড়—

—কি ? আমার বাড়ীতে ? তার মানে ?

এঁচড় দু'খানা বেশ বড বড়। আপনার বাড়ীতে দিয়ে এলাম।

—কবে ?

—এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হোল—এঁচড় পাডতে দেরি হোল—

বিপিন মাষ্টারের উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কতবড় অমোঘ মহৌষধ ওরা দু'জনেই তা জানে। বিপিন মাষ্টার আর কোনো কথা বল্লেন না, ওরা দু'জনে গট্ গট্ করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে, আমাকে টেনে ওরা বসতে চাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাষ্টার মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—বসতে চাইচে তা হয়েচে কি ? তোমার একার জন্যে বেঞ্চি হয়নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুণ এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লো। আবুল বসলো যুগলের ওখানে। যুগল বেচারীকে উঠেই যেতে হোল দু'দিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাষ্টার দেখেও দেখলেন না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝে-সুজেই আজ এঁচড় এনেচে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো ? কিন্তু তার চেয়েও বড় ধাক্কা আজ পৌঁছুলো এসে। ওরা দু'জনে

ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ি স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুণ বল্লে—কে রে? কে এল?

আবুল ঠোঁট উল্টে বল্লে—কি জানি!

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাষ্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বল্লেন—যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এসেচেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুণ সেই সঙ্গে এসে বসে ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুব, সব মুসলমান চাষীদের বাস। সে গ্রাম থেকে পডতে আসে একটি ওদের বযসী ছেলে, নাম তার হাযদাব আলি। হারুণ বল্লে—আমাদের পরনে ময়লা কা পড—

হাযদার বল্লে—তাতে কি হয়েচে?

—মার খাবি এখন—

—ইস্, তা আর জানিনে! মারলেই হোল।

কথাটা বল্লে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিযে ঢুকলো। একটু পরে সাহেবি পোশাকপরা ইন্‌সপেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাষ্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্‌সপেক্টার বাবু বল্লেন—এটি কোন্ ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা?

বিপিন বাবু বল্লেন—ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—কি নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বল্লে—হারুণ-অল-রসিদ।

—অ্যাঁ ?

—স্যার, হারুণ-অল-রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে ?

—আজ্ঞে, স্যার ?

—বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয়তো ?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাষ্টার হাসলেন।

—সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ ?

—আজ্ঞে, স্যার।

—কুতুবুদ্দীন কে ছিলেন ?

হারুণ বল্লে—রাজা।

—কোথাকার রাজা ? কোথায় থাকতেন ?

—বিলেতে।

—বেশ। আকবর কে ছিলেন ?

হারুণ ভেবে বল্লে—সেনাপতি—

—কার সেনাপতি ?

—রাজার।

—কোন রাজার ?

—বিলেতের।

—বাঃ বাঃ—হারুণ-অল-রসিদ বোগদাদী, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার। বোগদাদের খবর কি ?

—অ্যাঁ ?

—বলি বোগদাদের খবর কি ?

হারুণ ভাবলে বোগদাদ হয়তো, তাদের গ্রামের ইংরেজী নাম। তাই সে বল্লে—খবর ভালো, স্যার।

হেডমাষ্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কি আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাষ্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন— যেন ওকে গিলে খাবেন এই ভাব।

হারুণ ভেবে পেলে না কি এমন অন্যায় কাজ সে করে বোসলো।

বিপিন মাষ্টার নিশ্চয়ই চটেচে, ওর মুখে তার রেশ আছে।

ইনস্‌পেক্টর ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল্।

হেডমাষ্টার বল্লেন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাষ্টার এসে ওদের ক্লাসে বল্লেন—পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুণ-অল-রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাষ্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বল্লেন— সরে এসো এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো—হারুণ কাঁদো কাঁদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাষ্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বল্লে হারুণকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ডাকচেন।

কি বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল!

অফিসঘরে ওকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু জিগ্যেস করলেন—বাড়ি আপাতত কোথায়?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বল্লে—জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু মাইল, স্যার।

—কি খেয়ে এসেচো?

—পান্তা ভাত।

—মসরুর কোথায়?

—আজ্ঞে?

—খোজা মসরুর?

নাঃ কি বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন। এ সব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি। কেন এত বড় বড় লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপ্‌নে :মাষ্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুণের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাষ্টারটা ওঘরে কোথাও আছে নাকি। সকালের এঁচোড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল! অদৃষ্ট আর কাকে বলে? নাম রেখেচেন তার বাপ মা, তার কি দোষ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গডিয়ে পডলো ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বল্লেন—কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ি যাও। তোমার নামটা খুব বড় একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথে আবুল বল্লে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হোত। আজ তো পড়াই হোল না। তোকে কি বলছিল রে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু?

হারুণ বল্লে—তুই পাডগে যা এঁচড়। বিপ্‌নে মাষ্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি। কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কি মুস্কিলে পড়েছিলাম আজ বল্‌ তো!

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দু'জনে বাড়ি পৌছল।

সুলেখা

অজ-পাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ী ঢুকলো তখন সুলেখার কান্না এল। এই-সে কলকাতায় ইস্কুল-কলেজে পড়েছিল? এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে! কলকাতার নীলিমাদের বাড়ি গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরণ্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল-কাপড়ের জমির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ি গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভালো গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ-সবের এই পরিণতি?

এই জন্যে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন? না দিলেও পারতেন। আরও অল্প-বয়েসে বিয়ে দিলেও চলতো। তার চোখ ফুটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেতো অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্বামী শ্যামবর্ণ, অল্প বয়েস। বি-এ পাশও করেচে। কিন্তু হোলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরি করেন, গল্প-গুজোব করবার জন্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজ-পাড়াগাঁয়ে একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কতদূরে পড়ে রইল, ও এবার আই-এ পাশ করবে—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন!

সে আটকে গেল, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েচে···

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে ওদের গাড়ি এসে পৌঁছলো। কতকগুলো প্রাচীনা, কতকগুলো পাড়াগেঁয়ে-বৌ, তাদের মুখে চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে সুলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বৌভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠতো ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক-বাড়িতে প্রাচীনাদের হাতে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পূজোর সময় আসবো বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে, সুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লো। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কিভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়ীদের মধ্যে? যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল গিয়ে এককালে-ঠেকা দন্তহীন বুড়ীদের মধ্যে?

টাকা ছিল না কাকার। নতুবা শহরে বিবাহ হোতো।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গর-পছন্দ করেনি। ভালো ছেলে, পাশ-করা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়ি জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা জমি আছে, প্রজাপত্তর আছে, আগান-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকেলে গৃহস্থ।

তবে ওই যা কথা, সেকেলে····একেবারে সেকেলে।

শাশুড়ি সুলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকেলে মুড়কি-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন—বৌমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ি আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিও তোমার ছেলের বৌকে— জন্মোএইস্ত্রী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক।

সুলেখা শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারছড়াটা ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে? গৌরী কি ভাববে, কলেজের অনুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়?

দিন-পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্মে বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্যি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপেনি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ-সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা ক্ষার কাচে, খই মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গেঁয়ো-রান্না চচ্চড়ি, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া, ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবে জীবন নষ্ট করার কি মানে হয়?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুশ্রী চেহারার জন্যে আর চমৎকার গানের গলার জন্যে যা মানিয়েছিল ওকে! গৌরীর মা টিসুশাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরাজির অধ্যাপিকা তরুণী উষাদি গ্রিন্‌-রুমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর-বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের!

আজ মনে হচ্ছে কত কাল···

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হোতো? থাকতো সে উষাদি'র মত, নলিনীদি'র মত, মিস সেনের মত, মিস বিধুবালা গাঙ্গুলির মত অবিবাহিতা।

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটতো ঠিক বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুসি তুমি যাও, সিনেমা ছাখো, নাচগানের জলসা ছাখো ফার্ষ্ট-এম্পায়ারে—কি মজা!

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বল্লে—রাঙা-বৌ, এক কাজ করতে হবে যে!

সুলেখা বল্লে—কি দিদি!

—কলাইয়ের ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে। বুঝলে?

—বেশ।

—পারবে তো?

—করিনি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেচে। বেলা দু'টোর সময় কালো-ভোমরার মত মেঘ ক'রে নেমেচে ঝম্ ঝম্ জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্চে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে, তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্চে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্ত্তি করে ফেলেচে দু'ঘণ্টার মধ্যে। সুলেখা উঠে চোখ মুছতে-মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে সহরে দেখেনি কখনো। বকুল গাছের গুঁড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারেপাখীগুলো অঘোরে ভিজচে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম-গরম চা। সে নতুন-বৌ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে?...ও-মাগো, ওদের বাড়ির বুড়ীটা কি ক'রে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে। পাড়াগেঁয়েদের কাণ্ডই আলাদা।

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বল্লে রাঙা-বৌ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে ?

সর্ব্বনাশ ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লা'ল হয়ে উঠলো, অপ্রতিভ-স্বরে বল্লে—ওই যাঃ ! সেকথা মনেই নেই দিদি··· এক্ষুনি আমি যাচ্ছি ছাদে···

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিলো যে, মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কিরকম আনাড়িই না মনে করচে। যাকে 'স্মার্ট' ব'লে সবাই জানতো কলেজে। সুলেখা ধড়মড ক'রে উঠে ছুট দিল ছাদের দিকে, ওর জা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—ছুটতে হবেনা রাঙা-বৌ, বোসো—বোসো।

—বসবো কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল !

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই ? তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুম যে।

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে, তার জা। মজা দেখবার মত লোক নয়। ও বল্লে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে। সুলেখার জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বল্লে—রাঙা-বৌয়ের থিয়েটারি-ধরণের কথা শুনে হেসে মরি ! ও-মাগো ··

এ একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন ব'লে সুলেখা মেনে নিলে।

ডাল কখনো তোলেনি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়াগাঁয়ের লোকের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বল্লে—কি হ'চ্ছে গো বৌদিদি ?

—চুল বাঁধচি, এসো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো।

—গান করবে ?

—সন্দে-বেলা গান করলে, শাশুড়ি আমায় ভালো চোখে দেখবেন ? একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ-বাড়ির মধ্যে। সে হবে না ভাই। তবুও তুমি আজ প্রথম বল্লে গানের কথা।

—কেউ বলেনি বুঝি তোমায় বৌদিদি ?

—কে আর বলচে।

এইসময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ঘন হয়ে···কামিনী চলে যাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—চলি আজ বৌদিদি, আর একদিন আসবো।

এক-পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে সেদিন বিকেলে। সুলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে নেবুফুল ফুটেচে—বৃষ্টিসজল অপরাহ্ণের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ····

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বল্লে—কি হচ্ছে রাঙা-বৌ ?

—আসুন দিদি। কি আর হবে, এমনি বসে আছি।

—রান্নাঘরে চলো। দুটো ডাল ভাজবো, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে।

—আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে ? একটু অন্য রকমের কাজ—একটু ভালো কাজ···

নীরদা হেসে বল্লে—সময় নেই ভাই। দেখচো তো সংসারের কাজ নিয়ে বেহাতি।

—ওরই মধ্যে সময় ক'রে নিতে হয়···

বিরক্তিতে সুলেখার মন ভরে উঠলো। এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে ! এরা শুধু জানে, ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে। শুধু খাওয়া আর থাওয়া।

নীরদা বল্লে—তুমি তো রাঙা-বৌ নতুন এসেচো। এখন প্রথম প্রথম

তোমার খারাপ লাগবে—এরপর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অন্য কিছুতে মন যাবে না।

সুলেখা মনে-মনে বল্লে—সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক।

চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ভাজতে বসতে হোলো রান্নাঘরে। দু'টি ঘণ্টা সে কি খাটুনি! নীরদা ডাল ভেজে দিচ্চে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়চে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখে সুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়চে। কি কর্ম্মফলে এমন সংসারে সে এল?

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা শুনলে কে গান গাইচে···

সুলেখা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে—গুন্ গুন্ ক'রে কে গান ভাঁজচে—নিপুণ-কণ্ঠের আলাপ। ও ভাবলে—বা রে, এমন জয়জয়ন্তী অলাপ করে কে?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্ গুন্ সুরে আলাপ করচে, সে নিপুণা গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করতো। কিন্তু এ কি সম্ভব?

এখানে কে গান গাইবে এমন?

সুলেখা আরও শোনবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অন্যমনস্কভাবেই এক-টুকরো গান অল্প একটু সময়ের জন্যে গাইছিল—ঠিক গান গাইবার জন্যে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিস্ময়জড়িত-চোখে এসে শুয়ে পড়লো। সকালে উঠে এ-ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনে এলো রাত্রের সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ঘটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা···

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায়নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে

কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, চা খেয়ে বসে রান্না-বান্নার গল্প করলে। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি? এমন যে সুন্দর লাইলাক-রঙের জরিপাড় শাড়ি পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারও চোখ গেল না? কেউ বল্লেনা সে-কথা? না বল্লে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুড়িয়ে-খেতে একটা বাক্যি। সুলেখা ওদের কাছে 'মায়ামুকুর'এর গল্পটা করেচে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েচে, অথচ—গান গাইতে বল্লেও না তাকে কেউ! হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানেনা হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর সুকণ্ঠকে?

সুলেখার ইচ্ছে হোলো, এই মূঢ় অশিক্ষিতা মেয়েগুলোর সামনে একবার হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারী'র কিংবা 'এবার ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব্ব সুর-পুঞ্জে ঘর ভরিয়ে দেয়।

কারণ, যে-বাড়িতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম ছিল সে-বাড়িতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকেলে-শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছিল—বোধহয় তাকেই বিশেষ ক'রে শোনাবার জন্যেই। এ-গ্রামে কেউ বোধহয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা?

বাড়ি ফিরে দেখলে, ওর জা তালের বড়া ভাজবে ব'লে তালের রস বার করচে। ওকে দেখে বল্লে—রাঙা বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?

মেয়ের দল বল্লে—তুমি তো আর যাবে না বড়বৌদি, তুমি গেলে অবিশ্যি আজ খুব ভালো হোতো। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে?

নীরদা বল্লে—বোস্ সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বৌ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠলো তখন রাত ন'টা। মেয়ের দল ইতিমধ্যে দু'দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েচে। সুলেখার এসব কাজ অভ্যাস

নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায়? এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ করতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত।

মনে পড়লো, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালীর ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশী, খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারক গুণ তত নেই। জিবে ভালো লাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাদ্যের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ হোতো কি?

ব'সে ব'সে শুধু নির্ব্বোধের মত একরাশ তালের বড়া ভাজা…

ওর বড়-জা রান্নাঘরে ব'সে ওকে বল্লে—রাঙা-বৌ, আমার ঘর থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুয়ে নিই কুয়োতলা থেকে। বড্ড গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বল্লে—আলো আছে তোমার ঘরে?

—নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড়-জা'র ঘরে ঢুকে গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়লো একটা জিনিস।

ঘরের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে একখানা খাম পড়ে আছে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছাপা আছে তার ওপরে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র, বায়গ্রাম, বাহিরগাছি পোষ্ট, জেলা নদীয়া। তাড়াতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে—সতেরোই আগষ্ট তারিখে নীরজাসুন্দরী মিত্রের গান আছে রেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফরম্। উল্টে-পাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাত রেডিও-কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে? নীরজাসুন্দরী মিত্র কে? একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগলো। তাই যদি হয়? তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বল্লে—এ কার চিঠি, দিদি? নীরজাসুন্দরী কে?

ওর জা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে—দূর! ও-আবার তুমি দেখতে গিয়েচো? আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে—নীরদা।

—কিন্তু মিত্র কেন? ঘোষ হবে তো?

—বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও-আপিসে। ওরা আর বদলায় নি। ও কিছু নয় ভাই—রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বৌকে একথা বোলো না, আমার লজ্জা করে। তাছাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসব কথা জানালে কে কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা? হিরণ্ময় মিত্র, নাম শুনেচ বোধহয়?

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিষ্যা সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে! সুলেখা শ্রদ্ধায় ও স্নেহে নিজের আঁচল দিয়ে বড়ো জা'র মুখ মুছে দিতে দিতে বল্লে—একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তা'হলে আপনিই অনেক রাতে? ঘুমের ঘোরে শুনে সে দিন··· পায়ের ধূলো দিন···তখন আমি ধারণাই করতে পারিনি। এতদিন বলা আপনার উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানবো?

রূপো-বাঙাল

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাষ্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরী হওয়ায় মনে হোল কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা কাছারী থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাবালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা?

বাবা বাড়ী থাকতেও কি রূপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে?

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয়নি রূপো কাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকার কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে।

—যা যা তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্য্যন্ত নয়। রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেচি রূপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনিনি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রূপো কাকা আমাদের বাড়ীর কৃষাণগিরি করচে আজ ন'দশ বছর। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রূপো কাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্ত্তী গাড়ুহাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িযে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্যে। রূপো কাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্ত্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা মারা যখন যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদার বাবুকে বলে কয়ে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারীতে। আর বাড়ীতে বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা, প্রজা, খাতকপত্র এ-সব দেখা শুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিনটাকা মাইনের কৃষাণ রূপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভালো গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেচি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার পাঁচটা ধানের গোলা। এক একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্ব্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এ সব দেখা শুনা করে কে?

রূপো কাকা সব দেখা শুনা করতো। আশ্চর্য্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিযে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রূপো কাকা বাবাকে বলতো—বলি, ও বাবু, তুমি যে এসো বাড়ীতি ন' মাস ছ' মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল তো।

আদায় পত্তর ত এ বছর কিছু হোল নি। হাতীর পাঁচ পা দেখেচো নাকি? এত বড সংসারটা চলবে কিসি?

বাবা দু'মাস অন্তব দু'তিন দিনের জন্য বাড়ী আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদেব কর্জ্জ দিতো। নিজের দরকাব হোলে নিজেও নিতো।

আমরা সব ছেলেমানুষ কিছুই বুঝি নে। ঠা'কুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালোমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপো কাকার ওপর।

বাবা বাড়ী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপো কাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ'কাঠা কলাই দু'কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ'কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে? আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু'বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—রূপো বাঙাল একবিশ ধান দু'কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ,

ধান এগার কাঠা, কড়ি সাত কাঠা। এইভাবে রূপো কাকা অনর্গল বলে চলচে গত দু'মাসের মধ্যে কর্জ্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রূপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে আসেনি দু'তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়া এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই বিকেলে রূপোকে ডেকে পাঠালেন। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—বলো গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচি নে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকমকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা ব'ল্লে, তখন বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ ছয় পরে রূপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ী এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া স্বরে বলে উঠলেন—রূপো!

—কি?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিগ্যেস করি? তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাবো? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না তুমি জানো? এত বড়লোক তুমি হোলে কবে?

রূপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না?

এখন কাটবে না? এখন কাটবে বৈকি! হ্যাঁরে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না? বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—'তুমি' ছেড়ে রূপো কাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্ম্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বল্লেন—যা যা বকিস নে—

—না বকবো না—তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েচিস্—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে?

বলেই রূপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ীর মধ্যে। রূপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বল্লেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন?

ঠাকুরমা বল্লেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুই কি ক্ষেপলি?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ির মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রূপো কাকার হাত ধরে বল্লেন—রূপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রূপো কাকার রাগ কমে না, বল্লে—না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারবো না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝান হলো, রূপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বল্লেন—বেশ, তা হলে আমিই বাড়ি ছেড়ে যাই। রইল গোলা পালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্চি—

রূপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বল্লে—তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা ?

—কেন, তুমি ?

—মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে কবে মানুষ করলাম বলে কি তোর ছেলেপিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করবো ? আমি কি আর জোয়ান আছি ? এখন বুড়ো হইচি না ? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না আমি আর থাকবো না। কালই যাবো চলে।

—কোথায় যাবি ?

—মরেলডাঙা চলে যাবো। ঠিক বলচি যাবো। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রূপোদা, তুমি আমায় এমন করে বল্লে শেষকালে ? আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো—বলেই বাবা ফেলসেন কেঁদে।

রূপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বল্লে—কাঁদিস নে সীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বল্লাম ? তুইই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষে দুজনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুয়ের গুতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হোলেন না, রূপো কাকাও চাকরী ছাড়লেন না।

রূপো কাকা রাত্রে চৌকিদারী করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি এসে ঠাকুমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে সন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাষ্টার শুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে

দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এস না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাষ্টার দেখেচে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারী পোশাক প'রে লাঠি হাতে রূপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো।

এক একদিন হীরু মাষ্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করতো—কে বসে?

—মুই রূপো।

—বসে কেন? এত রাতে?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি? গোলার ধান যাবে, সীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা? মোর ওপর ঝক্কি কত! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না। সীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো। এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে রাত জাগতি—

হীরু মাষ্টার বলে—ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মত নিশ্চিন্দি হতে পারিনে তার কি হবে। ধান-গুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিন দিনের জ্বরে রূপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ী।

বাবার সাথে গিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম রূপো কাকাকে।

রূপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, শাদা দাড়ি রূপো কাকা পুরাণো মাদুরে শুয়ে। রূপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লেন—ও রূপোদা? কেমন আছ, ও রূপোদা—

রূপো কাকা চোখ মেলে বল্লে—কেডা? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু' কাঠা, বাড়ি দু' কাড়া, বিষ্টু ধেরিসি ছ' কাঠা ধান, বাড়ি চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতে পারবো না বলে দিচ্চি—ভুলে যাবো, লিখে রাখো—

এই রূপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোন কথা বলেনি রূপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা রূপো কাকা আমাদের গোলাপালার দায়িত্ব চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।

✓তেঁতুলতলার ঘাট

হারুর আজ আর জ্বর আসেনি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফূর্ত্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফূর্ত্তি থাকে না। কিছু না কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমান ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট জোড়া পিলে, আর সর্ব্বদাই ভয় ওই বুঝি জ্বর এলো।

অনেকেই ওকে দেখে বলে—ইস্! ছেলেটার মিত্যু দশা হয়েছে একেবারে। এবার বুঝি বা সরে। এ সব বলতো এমন সব লোকে, যারা ওকে ভালবাসার চোখে দেখে না। যে ভালবাসার চোখে দেখে, সে কি এমন কথা বলতে পারে! হারুও তা বুঝতো, বুঝে চুপ করে থাকতো। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত বড় অপরাধ, এজন্যে সে একদিকে যেমন বাড়ীতে বাবা মা ও পিসিমার, অন্য দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্যে।

অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। মলমলে রোদ পড়েচে পথঘাটের দুধারে বনে ঝোপে। রাস্তাঘাট এখনো খট খট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চীৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এই সব দিনে প্রত্যেক ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুস্‌কি পাখী বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপে ঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ীর চুনুর আর মণ্টুর বাড়ী যায়।

মণ্টু মায়ের জন্তে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ীর সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে বল্লে—কিরে, আজ জ্বর আসেনি তোর ?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ের মত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয় ! হারু বল্লে—না, জ্বর কিসের ? চল্ বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাটাগুলো দিয়ে আসবো। তুই একটু দাঁড়া।

—এ খেত করেচে কে ?

—তুই জ্বরে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবি নে ? এবার এ খেত আমি করেচি। মা বল্লে, ডাঁটা করে রাখ্ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হোল বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হোল, সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে ; একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করতো, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয় ভয় করে, আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মণ্টুর মত সঙ্গীকে সে গ্রাহ্যও করে না।

দুজনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকো এসেচে পূব দেশ থেকে, বড় বড গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, দু একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কি এমন মায়া যে জায়গাটার !

হারুর বড় ভাল লাগে। খেলা করবার মত জায়গা।

মণ্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলাকুচা লতার ফল মণ্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো দুলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েচে, তুলবার কি দরকার ? বেশ দেখাচ্চে গাছে। বেনে বৌ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্চে কাল কাসুন্দে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েচে তুজনের কারো খেয়াল নেই।

মণ্টু কাছে গিয়ে বল্লে—অমন করে বসলি কেন রে? জ্বর এল না কি?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাস্‌রে, গা যে পুড়ে যাচ্চে—বাড়ি যা বাড়ি যা—

হারু বিমর্ষভবে বল্লে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করে দিলি কেন? আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মণ্টু বল্লে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আস্‌তো, আমি মনে করে দেওয়ার জন্যে কি আর জ্বর এল?....ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ী চ—

বাড়ীতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে লাল ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে সে দেখে এসেচে। কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যে লাগে!

মাকে না বল্লেই হোল যে জ্বর হয়েচে। মণ্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বল্লে—তুই বাড়ি যা—আমি একা যেতে পারবো—

—যেতে পারবি ঠিক?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর। ও এখুনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ী ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয়নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয় তো লেপ মুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। সুতরাং ভাত যদি খেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত হবে না, এখুনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেচে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিকার ভাবে বলে—মা, খিদে পেয়েচে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকাল বেলা?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছা করেই সে মণ্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা

এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বল্লে—ভাত দ্যাও খিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন?

—আমার যা খিদে পেয়েচে!

—এখনো চচ্চড়ি হয়নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে—

—তাই দাও, তাই দিয়েই খাবো—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হোল, না খেতে বসলেই ভাল হোত। জ্বর চেপে আসচে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ দাঁতে দাঁত লাগচে এমন শীত! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ীব পেছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসলো। একটু পরে ওর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনি ধরলো, এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোব ঘোর ভাবে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে ভীষণ জ্বর এসেচে ওর।

ওর মা বল্লে—বসে আছিস কেন রোদে? শরীর খারাপ হয়নি তো?

—হুঁ।

—হুঁ মানে কি? জ্বর আসচে? সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ার মুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে? এমন করে ভুগে মরবি কদ্দিন?

বেশ। যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্ছে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো। হুঁস হোল যখন ওর আবার, তখন বেলা গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁটাল গাছটার মাথায়। শালিক পাখীর দল ভাঙা পাঁচীলের ওপর কিচ্ কিচ্ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বল্লে—কি খাবো মা?

—কি আবার খাবি? ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার? সাবু করে দেবো রাত্তিরে।

হারু নাকি সুরে বল্লে—না, সাবু আমি খাঁবো না—হুঁ-উ-উ—

—না সাবু খাবে না, তোমার জন্যে আমি পিঠে পুলি করি। চুপ করে শুয়ে থাক।

ভোর রাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর ঘুম ভেঙে যায়। শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব খিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে দেবে, সে চুপ করে শুয়ে থাকে ভোরের আশায় এবং ভোরের আলো খড়ের ঘরের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে লাগলো। ওর ঘুমকাতুরে মা চোখ না মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে লাগলো—বাবাঃ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোবো সে জো নেই। একটু চোখ বুজিয়েছি অমনি ষাঁড়ের মত চিচ্‌কার!…হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলো!

হারু নাকি-সুরে বল্লে—সঁবে চোঁখ বুজেচো বুঝি! রোদ উঠে গিয়েচে গাছপালার মাথায়। আমার খিদে পেয়েচে—উঠে দ্যাখো কত বেলা—

অবশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠেনি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে মাত্র! ওর মা ওঠবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকি সুরে চীৎকার সকাল বেলার দিকে এ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার পরে আপনি চুপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কি সুন্দর দিনটা। কেমন পাখীর ডাক বাঁশ গাছের মগডালে। কাল হারুর মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়া—যার যা ইচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না বা সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ির উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ! চমৎকার শসার জালি ঝুলচে কঞ্চির আড়ালে আড়ালে। কতবার লোভ হয়েচে ওর, কিন্তু বুড়ী বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা পাঁচ ছয় শসার জালি আর গোটা শসাকে যদি সাবাড় করা যায়…

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো।

মণ্টুদের বাড়ি গিয়ে এখুনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল। এত কান্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্যে।

এক ছুটে সে পৌছুল মণ্টুদের বাড়ি। মণ্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুকে দূর থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠা-মশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা মণ্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ীর মধ্যে।

হারু ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে?

মণ্টু পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন?

—কুমড়ো কাটা আমাবস্যে—

—কে বললে?

—সকলকে জিগ্যেস করে ভাখ্—

—কি করবি?

—তুই আর আমি বেরুবো। গানি বউয়ের বাড়ি সেই শসা গাছ আছে তো? আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি তোদের বাড়ি যাবো।

হারু সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির বাটির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস?

—মুড়ি।

—দে না একগাল?

এবার হারুর কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা মুছে মণ্টুর সামনে পেতে বললে—শীগ্গীর দে, তোর জ্যাঠামশায় আসচে। পরক্ষণে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে

পালালো। মনে ভাবলে—বুড়ো এসে পড়লেই বকতো, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কি কেপ্পন মণ্টুটা! একগাল মুড়ি কত ক'টা দিলে গ্যাখো—দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ী পৌঁছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্চে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ কিছুই নেই এ বাড়ীতে।

মা ওই এক রকমের লোক হারু জানে। অন্য লোকের মায়ের মত নয়। কাল রাতে যে খাইনি, জানো সবই, গ্যাও না বাপু খেতে সকাল সকাল। কাণ্ডখানা বেশ! একটু বেলা হোলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ তোমাকে লুচি ভেজে দিই, পিটেপুলি গড়িয়ে দিই, কাল সারারাত জ্বরে শুযোছো কিনা!

যেন জ্বর না হোলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিটেপুলি করে খাওয়ায় আর কি! সে এ বাড়ীতে নয়। এ বাড়ীর বাঁধা আছে চালভাজা, তিনশো-ত্রিশ দিন। লুচি!

কিন্তু ভাত? মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি? কথাটা সে ঘুরিয়ে জিগ্যেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমায় সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে?

—কেন, আমি।

—ইস্! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুন্টি দিতে—সারারাত জ্বরে কোঁ কোঁ করে ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন।

—কি খাবো তবে?

—শিউলিপাতার রস তো খেলিনে সকালবেলা। একটু বেলা হোলে দেবো এখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বল্লে—না সাবু নয়, দুখানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জ্বর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক্, দেখবো অখন।

সুতরাং মনে আর একবার খুসির ঢেউ উঠলো হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েচে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল। ও বাগানের খুব নিবিড় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বুড়ো মাদার গাছটা এক বার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁপ দাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখিয়েছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, দুবার পুজো এসেছে গিয়েচে তারপর—আর আসেনি।

মাদার গাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ভিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পট্‌পটি ফল দুলচে গাছে গাছে। বড বড় পট্‌পটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষা-দিনে পট্‌পটি ফল ছোঁড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পট্‌পটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট্‌-ফটাস্! যেন বন্দুকের শব্দ! তাই ওর নাম পট্‌পটি ফল।

আজকাল সবার হাতে ছাখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাটি আর পট্‌পটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পট্‌পটি ছুঁড়তে হোত না।

দুটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উঁচুতে। লতার-আগে দুলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফুলই নিয়ে যেতে হবে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েচে অনেক, খিদেও বেশ পেয়েচে।

বাড়ী গিয়ে রুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কি মজা! এতক্ষণ রুটি হয়েও

গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, মা নিশ্চয়ই তার জন্যে আগে করে রাখবে। আজ সে বেশ ভাল আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধ হয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্চে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মণ্টুরও শীত করতো, যদি সে আজ এই বনে ঢুকতো।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্য্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান বোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলি গাছের তলায় আধ রোদ আধ ছায়ায় বসে বসে গরুর গাড়ী দেখতে লাগলো।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ বসা হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হোল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয়নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভাল লাগে।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছলো, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটাকতক পিটুলি ফল। ওর মা বল্লে—ওমা, ই কি কাণ্ড! এই বলে গেলি খিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি। কোথায় ছিলি? ভাল আছিস তো?

—হুঁ—

—কোথায় ছিলি?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয়নি তো?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরণ আর চোখ মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হোল না। কাছে ডেকে বল্লে—তোর চোখ মুখ রাঙা দেখাচ্চে কেন রে?

ইদিকে সরে আয় গা দেখি—বাপরে, গা পুড়ে যাচ্চে। যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওর জ্বরের ঘোর কাটলো, তখন রাত হয়েচে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তক্তপোষের কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁসে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলচে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। তখনকার খিদে এখনও রয়েচে। সে কিছু খায়নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল? সে ক্ষীণ স্বরে ডাকলে—ও—মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করচে বোধহয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ী গিয়েচে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। মা অমন করে হাঁটচে কেন? আমসত্ত্ব চুরি করবে নাকি? সে তো আমসত্ত্ব চুরি করবার সময় অমনি······মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম সুরে বল্লে—বাবা হারু! কেমন আছ বাবা?

—ভালো।

—দেখি?

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ওঃ কি ঘাম ঘেমেচিস! এঃ, সব যে ভিজে গিয়েচে। হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজে সপ সপ করচে। ও বল্লে—মা, আমার খিদে পেয়েচে।

—খিদে পেয়েচে বাবা? আচ্ছা দেবো এখন। আহা বাবা আমার, সোনা আমার, শোও। আসচি আমি। মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন? অন্য সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে খিদে। ছেলের কেবল খিদে আর খাই খাই, জ্বর হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন? পা টিপে টিপে হাঁটা…হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা আমাবস্তে! ওঃ ভাল কথা মনে পড়েচে। এখন সবে সন্ধ্যে, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। এইবার মন্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ির বাড়ী শসা চুরি করতে যেতে হবে! আরও একটু রাত হোক। ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকে বল্লে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা। উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষি ছেলে—ও লক্ষি ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বল্লে—কেন, আমার সে ওবেলাকার রুটি? আমি খেয়ে শসা কাটতে যাবো এক জায়গায়।—আজ কুমড়োকাটা আমাবস্তে যে! জানো না?

ওর মা বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা আমাবস্তে গিয়েচে কাল—তুমি এই দুদিন ধরে বেহুঁস। মা মঙ্গলচণ্ডী, সারিয়ে দাও মা, সেরে গেলে পুজো পাঠিয়ে দেবো বটতলায়—

জোড়হাতে বটতলার উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।



দুই দিন

রামনগর বারোয়ারি তলায় আজ খুব জাঁকের যাত্রা। কলকাতা থেকে দল এসেচে, বেশ বড় দল। রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রার দল, যার নাম এ অঞ্চলের লোকের যথেষ্টই শোনা, কিন্তু এত বড় দল কি পাড়াগাঁয়ে আসে যখন তখন? এবার বহু চেষ্টার ফলে ওদের আনা হয়েচে। রামনগর উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা থেকে ফেরবার পথেই কাতু এ সংবাদটি জোগাড করে এনেচে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্ত্তাও হয়ে গিয়েচে কাতু ও তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে।

ননী ওদের বাড়ি এল পেয়ারা পাড়তে। কাতুর বাবা দুর্গাচরণ মজুমদার চোখে দড়ি বাঁধানো চশমা পরে বাইরের ঘরে বসে জমিজমাসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

ননীকে দেখে বল্লেন—কি?

দুর্গাচরণ বড় কড়া প্রকৃতির মানুষ। ননী ভয়ে ভয়ে বল্লে—জ্যাঠামশায়, কেতো আছে?

—কেন? কি দরকার তোমার?

—জ্যাঠামশায়, দুটো পেয়ারা পাড়বো?

—তা পাড়বে না কেন? তোমাদের জন্যেই তো গাছ করে রাখা। কেন পাড়বে না?

ননীর সাহসে কুলোল না পেয়ারার সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে। সে চলে যাচ্ছে বাড়ির বার হয়ে, এমন সময়ে কাতু তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল।

ননী বল্লে—ভাই, তোর বাবা পেয়ারা পাড়তে দিলে না—

কাতু আশ্বাস দিয়ে বল্লে—বাবা এখুনি উঠলো বলে। নসবাপুর যাবে

খাজনার তাগাদা করতে। সেই ফাঁকে তুই আর আমি পেয়ারা পাড়বো। আজ রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবি নে?

—তুই যাবি? দল খুব ভালো, না?

—ও বাবা। কলকাতার বড় দল, দেখিস কি চেহারা, কি সব সাজগোজ, কি গান—

—তুই কি করে জানলি? দেখিচিস নাকি?

—সবাই বলচে রামনগরের বাজারে। দুশো টাকায় এক রাত—আর আমাদের বেলেডাঙার দল আর-বছর ত্রিশ টাকায় এক রাত গাইলে—রামোঃ কিসের সঙ্গে কিসের কথা। দুশো টাকা আর ত্রিশ টাকা!

কাতু আর ননী খুব হেসে উঠলো এক চোট। তাদের মনে হলো এমন একটা মজার কথা তারা কখনো বলেনি বা শোনবার সুযোগ পায়নি। উৎসাহের চোটে কাতু রসিক বাঁড়ুয্যের দলের গুণাগুণ অনেক বাড়িয়ে বলে। তাদের দলের ভীম যে সাজে তাকে নাকি সে দেখে এসেচে, এক হাঁড়ি ভাত ডাল তার সামনে বেড়ে দেওয়া হয়েচে, তা সে একা খাচ্চে। তার চোখ দুটো লাল ভাঁটার মত, দেখলে ভয় হয়। গলার সুর কি! যেন বাঘের গলার আওয়াজ। ওদের তলোয়ার-গুলো কিন্তু সত্যিকার তলোয়ার, অন্য অন্য বাজে দলের মত রাঙ বা টিনের নয়।

বলা বাহুল্য এ সবের কিছুই কাতু দেখে আসেনি। সে অবিশ্যি যাত্রা দলের বাসাতে গিয়ে দেখেছিল অনেকগুলো লোক কলার পাতা পেতে ভাত খেতে বসেচে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভীম কোন্‌টা নকুল কোন্‌টা বেদব্যাস সে তার কিছুই জেনে আসে নি।

ননী সব শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—তোর বাবা তোকে নিয়ে যাবে। আমায় আমার মামা যেতে দেবে না। মামা যদি দেয়, মামীমা তো খাঁড়া উঠিয়ে আছে! আমার বড় ইচ্ছে যেতে।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করলে। ওরা যাবে নিশ্চয়ই। ননীকে যদি মামা না

যেতে দেয় তবে সে লুকিয়ে যাবে কাতুর বাবার সঙ্গে। দুইজনেরই বুক দুড় দুড় করচে কি হয় কি হয়।

সন্ধ্যার আগেই দুর্গাচরণ মজুমদার চাদর কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে যাত্রা শুনতে বেরুলেন। কাতু গেল বাবার সঙ্গে, কিন্তু ননী বেচারীর মামা প্রসন্ন না হওয়ায় তার বাড়ির বাইরে পা দেওয়া সম্ভব হোল না।

কাতুর মন বেলুনের মত ফুলে উঠেচে। এখুনি সে রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রা দেখতে পাবে এখানে!

এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে এখুনি!

কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহুদূর দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রা, তাদের হাতে চিঁড়ের পুটুলি, বগলে তামাক টিকের ঠোঙা। আসরের বাইরে এক একখানা থান ইট পেতে সবাই বসে গেল।

আসরে বাদ্যযন্ত্র আনা হোল। সুর বাঁধা, টুং টাং করতে আধঘণ্টা কাটলো। কাতুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে। রাজা সেজে কতক্ষণে আসবে। ও বাবাকে জিগ্যেস করলে—কি পালা হবে বাবা?

দুর্গাচরণ অন্য এক ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ধমক দিয়ে বল্লেন—দেখো এখন কি হবে। আমি কি জানি? দুর্গাচরণ যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বল্লেন—সত্যি আজ এদের কি প্লে হবে জানো? নলদময়ন্তী এদের নামকরা প্লে, দ্যাখো কি হয়।

এমন সময় পালার প্রোগ্রাম বিলি হোল আসরে। কাতু তার বাবার খানা চেয়ে নিলে। তারপর পড়ে দেখেই বিস্ময়ে আনন্দে বাবাকে দেখিয়ে বল্লে—বাবা, এই দেখো নলদময়ন্তীর পালা হবে। নলদময়ন্তী বাবা—দেখো না? ও বাবা—নল দময়ন্তী—

—আঃ নলদময়ন্তী তা কি করতে হবে? নাচবো? চুপ করে বসে দ্যাখো।

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চ-নল জাঁকজমকের সঙ্গে সলমা চুমকির কাজ করা জরির পোষাক পরে সভাস্থল আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের তরবারি আস্ফালন!

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা কাটাকাটির কি বাহার!

আর গান? এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্য্যন্ত সে শোনেনি পাড়াগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ, নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মত মেয়েরা। মেয়ে নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু দু একটি মেয়ে সম্বন্ধে কাতু ঠিক বুঝতে পারলে না ওরা ছেলে, না সত্যিই মেয়ে।

সে বাবাকে বল্লে—বাবা, ও বাবা—

দুর্গাচরণ বল্লেন—কি? কেন কথা বলচো? চুপ করে থাকো।

—ওরা মেয়ে না ছেলে?

—চুপ করে বসে থাকো। বকো না।

কাতু তন্ময় হয়ে গিয়েচে, তার বাহ্যজ্ঞান নেই। একটা দৃশ্যে তার মন নেচে উঠলো। এবার বোধহয় যুদ্ধের আয়োজন চলবে। কলিরাজ যে সেজেছে তার কি বিকট চেহারা আর সাজসজ্জা। সত্যিই লোকটা খারাপ নাকি? নিশ্চয় লোকটা খুব বদমায়েস। বুড়ো কঞ্চুকী কি হাসিয়েই গেল।

এইবার একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণায় সভার লোক কেঁদে ভাসিয়ে দিল, সেই সঙ্গে কাতুও।

রাজ্যহারা নল বনে দিশাহারা অবস্থায় একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েচেন (বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্যি নলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রমাণ পেয়েচে, কেননা তিনি বসে আছেন আসরের ঝাড় লণ্ঠনের তলায়), সঙ্গে রয়েচেন নিরাভরণা দময়ন্তী। প্রোগ্রামে আছে অলক্ষ্যে বিধিলিপির সঙ্গীত—নলের

করুণ বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখচে বিধিলিপি সাজঘর থেকে বেরুল কিনা।

কাতু অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠেচে।

কিন্তু ঠিক যে সময় একটি বালককণ্ঠের মধুর সঙ্গীতের সুরে আসর ভরে গিয়েচে, দেখা গেল ধীরে ধীরে বিধিলিপি গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকচে, সেই সময় দুর্গাচরণ মজুমদার হাই তুলতে তুলতে বল্লেন—চলো অনেক রাত হয়েচে। যাওয়া যাক। বাড়ি চলো—ছাতি নাও হাতে—

কাতু অবাক। বাবা কি সত্যিই বাড়ি যেতে চায়? ঠিক এই সময় মানুষে পারে আসর ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে? কাতু বল্লে—বাবা, এখন বাড়ি যাবেন কি বল্‌চেন? আমি যাবো না বাবা।

—না না চলো। ও আর কি দেখবে সারারাত্ত জেগে। রাত দশটা। ওই নাকে কান্না চলবে এখন সারা রাত। চলো, চলো—ছাতিটা নে হাতে—ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কাল আবার জেয়ালাতে খাজনার তাগিদে যেতে হবে ভোরে।

চলে আসতেই হোল। উপায় নেই কাতুর। ওর চোখে জল ভরে এল। বাবার ওপর বিরাগে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। কেমন লোক বাবা? কিচ্ছু বোঝে না। এমন সুন্দর জায়গা—!

রাগে সে বাবার সঙ্গে কথা বল্লে না সারা রাস্তা।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর পরের কথা।

কার্ত্তিকচরণ মজুমদার সকালে উঠে কাগজপত্র দেখচেন। কার্ত্তিকের মহাজনী কারবার আছে, আড়ত আছে ধানের ও পাটের। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ধানচাল হাত ফিরতি করে বেশ কিছু লাভও করেচেন। তাঁর কর্ম্মচারী হরিপদ এসে বল্লে—বড় বাবু ছে-কাটি ক'খানা গাড়ি যাবে?

—যে ক'খানা জোগাড় হয়। মাল কত ?

—দাদনের মাল হবে পঞ্চাশ মণ। আর ইদিক ওদিকে যা জোগাড় হয়।

—পাঁচখানা এখান থেকে নিয়ে যাও।

—লরির জন্যে শম্ভুকে খবর দিতে বলে দেলাম।

—লরি একখানা নয়, দু'খানা। আমের গুঁড়ি যাবে সাতটা। চার টন।

—আপনি বেরুবেন কখন ?

—আমি খেয়ে দেয়ে বেরুবো। তুমি চলে যাও আগে—

এমন সময়ে কার্ত্তিক মজুমদারের দশ বছরের পুত্র নীলু এসে বল্লে—বাবা আজ থিয়েটার হবে রামনগরে। দেখতে যাবো বাবা।

থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র কার্ত্তিক মজুমদার পেয়েছিলেন বটে, রামনগরের তরুণ সংঘ আজ কি যেন একটা প্লে করবে তাতে লেখা ছিল। কিছু চাঁদাও তারা নিয়ে গিয়েছিল একদিন এসে। কিন্তু কর্ম্মব্যস্ত কার্ত্তিকের সে কথা স্মরণ ছিল না।

নীলু বল্লে—বাবা যাবে তো ?

—দেখি আজ আবার অনেক গোলমাল। যেতে পারি কিনা দেখি।

—সে হবে না বাবা। তুমি না গেলে আমি যাবো কার সঙ্গে ? আমার দেখা হবে না। থিয়েটার কক্ষনো আমি দেখিনি—

—আচ্ছা, যা, সকালে উঠে এখন পড়গে যাও—সে তো ওবেলা, তার এখন কি ?

এই সময়ে পাটের মহাজন ফলেয়ার মাণিক মণ্ডল উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে —বড় বাবু, আমার তার কি হোল ?

—কিসের ?

—আমার সেই মামলা আজ মিটিয়ে দেন বাবু।

—দেবো। আজ পঞ্চাশ মণ আনচি দাদনের মাল, আরও একশো মজুত। তোমার ক'খানা লরি ?

—দুখানার বায়না দেওয়া আছে। মাল বেশী হোলে আরও একখানা

আনবো। আমায় দুশোমণ জোগাড় করে দিতে হবে আপনার। একটু নেক-নজর করুন—

কার্ত্তিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন চা খেতে। কার্ত্তিকের স্ত্রী বল্লেন—তা যাওনা একবার খোকাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনো না? পাড়াগাঁয়ে ও সব জিনিস তো কখনো হয় না—এবার হচ্ছে যখন ওকে দেখিয়ে আনো। ও কখনো দেখেনি।

কার্ত্তিককে অগত্যা যেতে হোল সন্ধ্যার সময় রামনগরের বাজারে, স্ত্রীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে। নতুবা ঝগড়া বাধে। কিন্তু মন তার ভাল ছিল না। কর্ম্ম-চারীরা সংবাদ দিয়েচে দাদনের পাট আশানুরূপ আদায় হয়নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা ছড়ানো রয়েচে চাষী মহলে ধান আর পাটের দাদন বাবদ। গত দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে ধান চাল বিক্রি করে মোটা টাকা ঘরে এসেছিল বলেই এবার আশায় আশায় এত টাকা ছড়িয়ে দিলেন, কিন্তু বাজার হঠাৎ নেবে যাবে বুঝতে পারা যায় নি। ধানের দামও অত্যন্ত কম, পাটও তথৈবচ। তারপর অতগুলো ছড়ানো টাকার বদলে ধান বা পাট আদায় হোল না আজও।

নীলু দুধ-চিড়ের ফলার খেয়ে এসেচে। ছেলেমানুষের খিদে বেশী। কার্ত্তিক কিছু খেয়ে আসেন নি, তিনি অর্থ উপার্জ্জন-শক্তি অর্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-শক্তি হারিয়েছেন। রাত্রে খান দুখানা রুটি আর একটু দুধ। আগে খেতেন সুজির রুটি কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজার ঘনীভূত অবস্থায় সুজী পাওয়া যায় না, আটার রুটিই খেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পরেই থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চ্যাংড়া ছোকরা-দের ব্যাপার, হৈ চৈ করতে দুঘণ্টা কাটবার পরে রাত সাড়ে ন'টার সময় কনসার্ট বাজনা সুরু হোল। একালের থিয়েটারে ও সব অচল বলে কোন সহর-ঘেঁসা অতি-আধুনিক তরুণ সভ্য আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত আপত্তি টেকেনি। কনসার্ট না বাজলে এ পল্লীগ্রামে থিয়েটার জমবে কেন?

কার্ত্তিক ছেলেকে নিয়ে একেবারে সামনের আসনে বসেচেন। তার কারণ এ নয় যে তিনি ভালোভাবে অভিনয় দেখতে পাবেন সেই উদ্দেশ্যে।

এর প্রধান কারণ রামনগরের বাজারের প্রসিদ্ধ আড়তদার শরৎনাথ ওখানে বসেছে। শরৎনাথ এ অঞ্চলের বড আড়তদার, তার পাশে বসে কার্ত্তিক মজুমদার ব্যবসার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি আসলে জানতে চান শরৎনাথের দাদন অনুযায়ী পাট ধান আদায় হচ্চে কিনা। কেন এ বৎসর তাঁর এ বিপর্য্যয় ঘটলো।

শরৎনাথ ঘুঘু লোক, সে ব্যবসার প্রকৃত সংবাদ কাউকে প্রকাশ করতে রাজী নয়। তুজনেই যখন কথাবার্ত্তায় মজগুল তখন ষ্টেজে বন্দী অক্ষম সাজাহান জাহানারার হাত ধরে বিলাপ করচেন।

শরৎনাথ বল্লে—আর ভায়া, সে জুৎ বাজারের নেই। নতুন ধান সাড়ে তিনটাকা মণ। আলমপুর পরগণা ভোর পাটের দাদন ছড়িয়েচি, তুশো মণ পাট এখনো মজুত হয়নি। ব্যবসার দিন চলে গিয়েচে। কার্ত্তিক মজুমদার বল্লেন—আরে দাদা, তোমরা হলে হাতী। গেলেও তু-পাঁচ হাজার, মরবে না। আর আমরা হচ্চি মশা, সামান্ততেই কষ্ট পাবো। তারপর—

নীলু বলচে—বাবা, ওই ত্যাখো আওরংজেব—বাবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে আওরংজেবের কথা—সেই আওরংজেব—

—আঃ, তুমি খোকা বোকো না।

শরৎনাথকে কার্ত্তিক সব কথা খুলে বলেন নি। ব্যবসার গুপ্ত কথা কেউ বলেনা।

পাঁচশো মণ পাট তিনি চিনিলি কাপাসডাঙ্গার আড়তে জমা করে রেখেচেন, গরুর গাড়ি অভাবে আনতে পারচেন না সদর আড়তে, এখান থেকে লরিতে বোঝাই দেবেন।

গরুর গাড়ির কি ব্যবস্থা করে থাকেন শরৎনাথ, এইটি কার্ত্তিক মজুমদার জানবার উদ্দেশ্যে বার বার তিনি সেই কথাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন।

সাজাহান বলচেন—দেবো লাফ, দিই লাফ—

নীলুর চোখ বেয়ে জল পড়চে। সে কথার অর্থ যে সব বুঝচে তা নয়, সাজাহানের কথা বলবার ভঙ্গিতে তার কান্না আসচে।

নীলু বল্লে—বুড়ো কি বলচে বাবা? লাফ দেবে কোথায়?

কার্ত্তিক মজুমদার জবাব দিলেন—আঃ চুপ করো। শোন কি বলচে। দুষ্টুমি করতে নেই।

দুষ্টমি সে কি করলে, বুঝতে না পেরে নীলু চুপ করে রইল।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটলো। শরৎনাথ পাঁচখানা গরুর গাড়ি কাল সকালে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেচে।

বল্লে—কত সকালে?

—এই সাতটার সময়।

—তোমার বাড়ি পাঠাবো, না আড়তে?

—সদর আড়তে।

—লরি জোগাড় আছে?

—সে জন্যে ভাবনা নেই। সুবল লরি দেবে বলেচে—ইষ্টিশানে পৌঁছে দেবে মাল।

—ভাড়া মণকরা না টিপ পিছু?

—টিপ পিছু।

জহরৎউন্নিসা রাজসভায় আওরংজেবকে হত্যা করতে গিয়েছিল এইমাত্র। খুব একচোট হাততালি পড়তেই কার্ত্তিক মুখতুলে চেয়ে দেখলেন। সুলতান সোলেমানের সঙ্গে আওরংজেবের কথা কাটাকাটি হচ্ছে। কার্ত্তিক মজুমদার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত রাত হয়েচে? এগারো?

আর তিনি থাকতে পারচেন না। কাল সকালে উঠে সদর আড়তে শরৎনাথের প্রেরিত পাঁচখানা গাড়ি বাদে আরও অন্তত পাঁচখানা গাড়ির জোগাড় রাখতে হবে।

নীলু বল্লে—না বাবা, আমি এখন উঠবো না—কেমন জায়গাটা হচ্ছে আর তুমি উঠচো এখন—

—চলো চলো। ওসব দেখবার অনেক সময় আছে। কাল রাত থাকতেই আমাকে উঠে মুচিপাড়ায় লোক পাঠাতে হবে গাড়ির জন্যে। তোমাদের কি? ভাবনা চিন্তে তো নেই, বাবা—নাও ওঠো—

নীলু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার সঙ্গে আসরের বাইরে এলো।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে সতৃষ্ণ ও সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার দূরের আলোকিত ষ্টেজটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কার্ত্তিক মজুমদার বল্লেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—হাঁ করে দেখচো কি পেছন ফিরে? চোখ দিয়ে চেয়ে পথ হাঁটো—অন্ধকার রাত্তির—



মাকাললতার কাহিনী

এই বর্ষায় আমাদের গ্রামের নানা বনে ঝোপে মাকাললতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েচে। আমি মাকাললতা বড় ভালবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়লো মাকাললতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাললতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেচে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকালফলের শ্যামল রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপেঝাপে সবুজ আপেলের মত ফলগুলি, একদৃষ্টে কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখী গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয়নি আজও, তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাললতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেচে। আর একটি মাকাললতার সুন্দর ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেচে গোপালনগর বাজার ছাড়িয়ে পুরোনো ডাকঘরটায় সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটরলতার, মটরফলের গুচ্ছ ও মাকালফল পাশাপাশি দুলচে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্য্যতপ্ত কোনো উদ্যানে আপেল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ একসঙ্গে ফলেচে—বাংলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গল এ নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাললতার ফুলগুলির কোনো কোনোটাতে রং ধরেচে। ক্রমে সেগুলোতে একটু করে রং চড়লো সূর্য্যতাপে, রাঙা টুকটুকে গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজপত্রসম্ভারের মধ্যে রূপসী নববধূর মুখের মত উঁকি মারচে রাঙা টকটকে সুঠাম সুগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকালঝোপ আমার কাছে কি অপূর্ব্বই লাগে! নদীর ধারেরটি ও এই বটতলার।

নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েচে এক নিবিড় লতাবিতানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা সাঁই বাবলা গাছের মাথায় মাকাললতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এই ঝোপ তৈরী করেচে। সাঁই বাবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না দেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা পাতা, ভাঁকা বাঁকা শাখা প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জরীর মত ফুল হয়েচে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাললতার ঝোপ—ওর মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েচে এদিকে ওদিকে মাকাললতার দীর্ঘ ডালগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, লতাগ্রভাগে, সবুজ পত্রান্তরালে চিক্কণশ্যাম অথবা লাল টকটকে মাকাল ফল।

এর অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের জন্যে পটভূমি রচনা করেচে পাশে বড় গোয়ালে লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখা, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ আর গাছের তলায় শেওড়া, বৈঁচি, ভাট, বনকচু, বনআদা, সন্ধ্যামণির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব্ব রৌদ্র পরিস্রুত হয়ে আসে বড় গোয়ালে লতার বড় বড় পানের মত পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্য্যকিরণে, একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর ঊর্দ্ধে নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েচে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে, শালিক, ছাতারে. ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠি, শ্যামা, দুর্গা, টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষীকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেচে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নম্রমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে দুলচে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে দুলচে রাঙা টুকটুকে মাকালফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাগ মাকালফলই পেকেচে, কচিৎ দু-চারটে কাঁচা আছে।

এই মাকালঝোপ কি যাদু জানে। বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যাম বনানীর অন্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক

মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্ত্তেই। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ!

এই ক্ষুদ্র মাকাললতার ঝোপে আমার মন কেন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানিনে বল্লে কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিসটাকে ঘোরালো করা যেতো। কিন্তু এর কারণ আমি জানি।

কি জানি?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাত বেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স, ইচ্ছামতীতে বনসীমতলার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকালফল-দোলানো ঝোপটি দেখবো বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাড়িনে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ঊর্দ্ধে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাললতার ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি! রং-এর কি তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট্! চিক্কণশ্যাম লতাবীথির শ্যামল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি··· আপেল ফলের মত গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লালে মেশানো —এর একেবারে সিঁদূরের মত রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাললতাগুলো এদিক ওদিক অদ্ভুতভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল, এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টির আইডিয়ারূপী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন্ দেবতা তিনি? কত বড় শিল্পী তিনি?

"কল্পনাসৃষ্টিবীজঞ্চ"

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাললতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুগোল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? বাষ্পাগ্নি-প্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেচেন, সেই মহারুদ্রের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূন্যের দূর প্রান্তে; আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীগ্রহের এক কোণে সুনিভৃত নির্জ্জন লতাবিতান, সূর্য্যের সে বিরাট বাষ্পতেজ বহুমাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে সজল বর্ষার হাওয়ার মধ্য দিয়ে, বসন্ত-দিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে মোলায়েম হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেচে,—আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ, সুপুষ্ট, রাঙা মাকালফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান!

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে··

যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা··· সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনে হয়তো। মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে······

হেথা নীল আকাশের তলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে,
হোথা কোথা কত দূরে
'ওমিক্রন্ সেটি' ঘোরে
সঙ্গে তার সুশুভ্র বামন *

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হয়তো। কিন্তু লোকেদের জন্যে এ রচিত নয়—যার উদ্দেশে সেই প্রভাতের কনকদ্যুতিমণ্ডিত বন-বীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে রচিত, তিনি কৃপা ও প্রশ্রয়ের স্মিতহাস্যে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে গ্রহণ করেচেন অক্ষমের সে স্তুতি। ওমিক্রন্ সেটির অগ্নিলীলার মধ্যে এই

* ওমিক্রন সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরেজীতে 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' শ্রেণীর।

গোল গোল রাঙা মাকালফলের স্বপ্ন লুকানো আছে। ওমিক্রন্ সেটির চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্যারা সে দেশের বনবীথির অন্তরালে, সেখানকার অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শয়নে শুয়ে দিনপাত করেন, কে জানে সেই বনবীথির মাঝে এমন মাকাললতা, এমন দোদুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপের অন্তরালে এমন টুকটুকে রাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশী দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক্ক অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—একমাস দেড়মাস ধরে কত রূপে একে দেখেছি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জ্জন ভাদ্রদ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে উদার নীলাকাশের তলে, ঘুঘুডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্না'রাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়। বাবলার হলদে ফুল আর সাঁইবাবলার ফুলের শিস্, তার মধ্যে দুলে দুলে হলদেডানা শাদাডানা প্রজাপতির মেলা, তার মধ্যে দোদুল্যমান মাকাললতার নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয়, তপোবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন যেন সারাদেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসের মধ্যে অন্তত চ'সাতদিন দেখেছি। সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলবো, আম্রশাখা ও সাঁইবাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকাল-ফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন। পাগল করে দেয় ওই স্বপ্ন।

আমি জানি, তেমন ভাব ও স্বপ্নালুতা সারা বছরে একদিন এলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়—তাই এই মাকাললতার সীজন্—এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাললতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র অতি সুন্দর।

সৌন্দর্য্যের পূজারী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম কর।

জয় হোক মাকালফলের! জয় হোক ওমিক্রন স্টেটির। কত বড় ও কত ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিস্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি বিচিত্র। যার মন খারাপ হয়েছে সে অমৃতের সাগরে এসে তীর্থজল আহরণ করুক। প্রত্যক্ষ করুক ঋগেদের শিবরুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রেও তুমি, পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মাকালফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে মাকাল-লতার শ্যাম শোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণদিনের প্রতীক্ষায় থাকবে—সুপক্ক মাকালফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল দিনের অপরাহ্ণে আবার এদের দল আসবে ঘুরে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা-ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে…অনন্তের সসীম প্রতিনিধির মতো · কেউ খবর রাখে, কেউ রাখে না।

বংশলতিকার সন্ধানে

সন্ধ্যার কিছু আগে নীরেন ট্রেণ হইতে নামিল। তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের দেশের। কখনো সে বাংলা দেশে আসে নাই ইতিপূর্ব্বে এক কলিকাতা ছাড়া।

নীরেনের দাদামশাই রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে গিয়া সে যেন জল না ফুটাইয়া খায় না, মশারি ছাড়া শোয় না, নদীর জলে না স্নান করিয়া তোলা জলে স্নান করে। নীরেনের স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার, ডাম্বেল মুগুর ভাজিয়া শরীরটাকে সে শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বড়লোকের দৌহিত্র, অভাব অনটন কাহাকে বলে জানেনা। মনে নীরেনের বিপুল উৎসাহ। চোখের স্বপ্ন এখনও কাঁচা, সবুজ।

একটা লোক প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে সাজানো দূর্ব্বাঘাসের ওপর গরু ছাড়িয়া দিয়া গরুর দড়ি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নীরেনের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। নীরেন বলিল—রামচন্দ্রপুর কতদূর জানো?

লোকটা বলিল—কেন জানবো না? মেটরি রামচন্দ্রপুর তো? এখেন থে ঝাড়া তিনকোশ পথ—

—তিন কোশ?

—হাঁ বাবু। কনে যাবেন সেখেনে?

—বাঁড়ুয্যে বাড়ী।

—তা যান বাবু এই পথ দিয়ে—

নীরেনের কাছে এ সব একেবারেই নতুন। এই আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের মধ্যের পথ দিয়া সে যাইবে তিনক্রোশ দূরের গ্রামটিতে। ওই মাঠের মধ্যে কত মাটির ঘরে ভর্ত্তি পাড়াগাঁর পাশ কাটাইয়া তাহাকে যাইতে হইবে। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়স যার দুনিয়া তার পায়ের তলায়, সে অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণখনির

সন্ধানে বাহির হইতে পারে, সে উত্তরমেরু-অভিযানে একঘণ্টার নোটিশে যোগ দিতে পারে, মাত্র একটা ছোট স্যুটকেসের মধ্যে টুথব্রাশ আর তোয়ালে পুরিয়া।

চৈত্র মাস। স্টেশনেব পেছনে মাঠের ধারে বড় একটা নিম গাছ। ফুটন্ত নিমফুলের ভুরভুরে সুবাস বাতাসে। নিমগাছ অবশ্য তাদের আলিগড়েও আছে, কিন্তু এমন রহস্যময়ী অজানা সন্ধ্যা মাঠের প্রান্তে তাহার জীবনে ক'টা নামিয়াছে?

নীরেন জানে, যদিও সে দিল্লী ও আলিগড়ে মানুষ, একবার কাণপুরে আসিয়া ভাবিয়াছিল প্রায় বাংলাদেশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। পাঞ্জাবের অসম জলহাওয়ায় তাব শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে—হয় ভীষণ শীত, নয়তো দুর্দ্দান্ত গরম—একশো বত্রিশ ডিগ্রী উত্তাপের হাওয়া গা হাত পা পুড়াইয়া বহিতেছে—সেখানে গ্রীষ্মের দুপুরে বসিয়া বসিয়া বাদশাহী তয়খানা ও সুন্দরী ইরাণীদের স্বপ্ন লু'র আগুনে ঝলসাইয়া যায়।

নীবেন মাঠের মাঝখানের পথ বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে—নিশ্চয় আজ পূর্ণিমা, নতুবা সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠিবে কেন? দুখানা গ্রাম পথে পড়ে······রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতেছে। একজন বলিল—কনে যাবা?

—রামচন্দ্রপুর।

—বাড়ী কনে?

—কলকাতা।

কলিকাতা বলাই সহজ, কারণ আলিগড় বলিলে ইহারা কিছুই বুঝিবে না। কিছুদূর গিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পল্লী—নীরেন্দ্র নাম জিজ্ঞাসা করিল। রাস্তার ধারেই একটা পুরনো কোঠাবাড়ী, গোটা দুই নারিকেলগাছ, দুটি বড় ধানের গোলা নারিকেল গাছটির তলায়। জন পাঁচ ছয় লোক গোলার কাছে উঠানে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কথাবার্ত্তা বলিতেছে—নীরনকে দেখিয়া বলিল—বাড়ী কোথায়?

—কলকাতায়।

—ইদিকি কোথায় যাওয়া হবে?

—রামচন্দ্রপুর।

তাহারা পরস্পর চাওয়াচায়ি করিয়া বলিল—এই রাত্তিরি সেখানে যাতি পারবেন না।

নীরেন বলিল—কেন?

—তিনকোশ পথ এখান থেকে, তা ছাড়া গরম কাল, মাঠের পথ, সাপ খোপের ভয়। কার বাড়ী যাবা রামচন্দ্রপুর?

—বাঁড়ুয্যে বাড়ী।

—কোন্ বাঁড়ুয্যে-বাড়ী? সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ তো নেই?

—এক বুড়ী আছে না?

—আছেন বটে এক মা ঠাকরোন। ওই বাঁওড়ের ধারে গোলাবাড়ীতে থাকেন। তা তিনি আবার মাঝে মাঝে তাঁর জামাইয়ের বাড়ী যান কিনা? দেখুন, আছেন কিনা।

সেখানে পৌছাইতে নীরেনের বড্ড রাত হইয়া গেল। গ্রামটিতে চারিধারে বাঁশবন আমবনের নিবিড় ছায়া, প্রথমেই গোয়ালাদের পাড়া, তারপর বড মাঠ একটা, গোটা দুই বড় পুকুর, শেওলায় ও কচুড়ীপানায় ভর্ত্তি।

পথের ধারে একটা খড়ের ঘরে তখনও টিম্ টিম্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে একটি লোক উত্তর দিল, সেই গ্রামই রামচন্দ্রপুব বটে। বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বুড়ী? হাঁ, আর একটু আগে বাঁওড়ের ধারে সারি সারি নারিকেল গাছওয়ালা বড় আটচালা খড়ের ঘর।

নীরেন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। বড় একখানা আটচালা ঘরের পাশে ছোট রান্নাঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছিল।

নীরেন উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—বাড়ীতে কে আছেন?

একটি বৃদ্ধা টেমি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কে ডাকে ?

—আমি।

—কে বাবা তুমি ?

—আমাকে কি চিনতে পারবেন ? আমি আলিগড় থেকে আসচি।

বুড়ী টেমিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া নীরেনের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে কৌতূহল ও সন্দিগ্ধতার রেখা। হাতের তালু চোখের উপর আড় করিয়া ধরিয়া আলো হইতে চোখ বাঁচাইবার ভঙ্গি করিয়া আরও দু এক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—কে বাবা ?

—আমার বাবার নাম ৺রাজকৃষ্ণ মুখুয্যে—

বুড়ী আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল—রাজকেষ্ট ? রাজকেষ্ট ?

—আমাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল গড় মুকুন্দপুর—আমার ঠাকুরদাদার নাম ৺তারিণীচরণ মুখুয্যে—আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল সামতাবেড়ে, মায়ের নাম ছিল অমিয়বালা—

—ও! এখন বুঝলাম। তুমি আমার মেয়ের সইয়ের ছেলে!

—হাঁ দিদিমা।

—এসো এসো ভাই! কত কালের কথা সব। তোমাদের মুখ দেখে মরবো এইটুকু বোধ হয় ছিল অদেষ্টে। আর সবাই ছেড়ে গিয়েচে বাবা, শুধু আমিই পড়ে আছি!

—সই-মা কোথায় ?

—সে তো আজকাল এখানে থাকে না। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ী, এই পাশের গাঁ।

—আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেচি।

—আজ রাত্তিরে এখানে থাকো। কাল যেও এখন সকালে। এখান থেকে দু কোশ।

—এই যে বল্লেন পাশের গাঁ ?

—মধ্যে মাদারহাটির মাঠ আর জলা পড়ে যে ভাই। ছ'কোশের বেশি ছাড়া কম হবে না।

নীরেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। এ যেন নতুন একটা জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন দেশে সে কখনো আসে নাই। যে দেশে তাহার জন্ম. সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কল্পনা করিতে পারে না গ্রামের মধ্যে। নতুন ধরণের গাছপালা, অসংখ্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের মৃদু সৌরভ। বুড়ীর রান্না শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল। কেবল সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ বাহির-হওয়া লেপাপোঁছা মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার পাতা পাতিয়া বুড়ী তাহাকে খাইতে দিল। রাঙা আউশ চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, সোনা মুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলুভাতে, ঘন আওটানো সরপড়া দুধ, দুটি পাকা কলা, একদলা আখের গুড়ের পাটালি। অদ্ভুত রান্না বুড়ীর হাতের। আলিগড়ের পশ্চিমা পাচকের হাতের রান্না খাইয়া সে আজীবন অভ্যস্ত—এমন চমৎকার রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না!

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে বলিল—এমন রান্না কখনো খাইনি দিদিমা! শুনতাম বটে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের রান্নার কথা—কিন্তু এ যে এমন চমৎকার তা ভাবিনি—

বুড়ী হাসিয়া বলিল—রান্না করতে পারতেন আমার শাশুড়ী। তাঁর কাছেই সব শেখা। ডাকসাইটে রাঁধুনি ছিলেন আটখানা গাঁয়ের মধ্যি—

বুড়ীর কথার মধ্যে যশোর জেলার টান নীরেনের বড ভাল লাগিল।

শুইয়া শুইয়া উঠানের নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পাতার কম্পন দেখিতে দেখিতে নীরেন ভাবিতেছিল, এই তাহার স্বদেশ, তাহার অতি প্রিয় স্বদেশ। এই তাহার মায়ের জন্মভূমি, পিতার জন্মভূমি, পূর্ব্বপুরুষদের জন্মভূমি—বাংলা দেশ। কেন এতকাল সে মাতৃভূমিকে ভুলিয়া ছিল? ভাগ্যের দোষ। সে কি জানিত এত

সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের রাত্রির অন্ধকারে? গন্ধভরা অন্ধকারে? পাখীর ডাকের মধুর তান সে হিমালয়ে শুনিয়াছে। আলমোড়ায় ল্যান্সডাউনে শুনিয়াছে। তাহার ধনী মাতামহের সঙ্গে কয়েকবার সে সব স্থানে সে গিয়াছিল। দেবতাত্মা নগাধিরাজ মাথায় থাকুন—মাথায় থাকুক 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর অপূর্ব্ব দৃশ্য, মুসৌরীর অতুলনীয় গিরিশোভা—এখানকার পক্ষীকুলের সুমিষ্ট কাকলী যেন বহুপরিচিত বিগত দিনের প্রিয়জনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, কত দিনের ঘরোয়া কাহিনী এদের সঙ্গে জড়ানো।

বুড়ী বলিল—ঘুম হচ্চে না ভাল গরমে বুঝি? পাখা নেবা একখানা?

—না দিদিমা। নতুন জায়গা বলে ঘুম আসচে না, গরমে নয়।

—এবার ঘুমিয়ে পড়ো ভাই—

—হাঁ দিদিমা— ?

—কি ভাই?

—আমার বাবাকে আপনি দেখেছিলেন?

—না ভাই, আমার কোথাও যাতায়াত ছিল না। শুনিচি তাঁর কথা, দেখিনি কখনো—তোমাদের গাঁ ছিল তো—

—গড় মুকুন্দপুর।

—নাম শুনিচি, তবে যাইনি সেখানে।

সকালে উঠিয়া বুড়ী বলিল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা সহরের লোক, সকালে কি খাও?

নীরেন হাসিয়া বলিল—যা খাই, তা কি দিতে পারবেন দিদিমা? চা?

বুড়ী বলিল—ও আমার পোড়া কপাল। ও সব যে কখনো খাইনি ভাই, ও সবের পাটও নেই। একটু বেলের সরবৎ করে দি। ডোবার ধারের বেলগাছটায় কাল দুটো পাকা বেল পেইছিলাম ভাই।

চায়ের বদলে বেলের সরবৎ। উপায় কি? খাইতেই হইল তাহাকে। বুড়ী বলিল—তুমি কি মনে ক'রে এসেছিলে ভাই?

সেই কথাটা বলাই নীরেনের পক্ষে শক্ত। সে যে জন্য আসিয়াছে প্রিয় পৈতৃক পল্লীগ্রামটিতে, বৃদ্ধা কি সে কথা বুঝিতে পারিবে? সে বলিল—বেড়াতে এলাম দিদিমা।

—এর আগে কখনো আসনি?

—না দিদিমা।

দুপুরের আগেই তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এখান হইতে, কিন্তু বুড়ী ছাড়িল না। দুপুরের পরে রোদ অত্যন্ত চড়িল। বেলা চারটার আগে বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। যাবার সময় বুড়ী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—এসো, এসো, ভাই, তোমার সইমার সঙ্গে দেখাশুনো করে আবার এখানে আসবে কিন্তু। ভুলে যেও না ভাই। আচ্ছা ভাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নীরেন আসিয়া মাদারহাটির মাঠ ও জলার মধ্যে পড়িল। প্রকাণ্ড বিল, পদ্মফুল ফুটিয়া থৈ থৈ করিতেছে, পদ্মের পাতার ভিড়ে জল দেখা যায় না, একদিকে একটি অন্তরীপ মতন স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ—নীরেনের ইচ্ছা হইল ওই গাছগুলির তলায় সে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করে। এই সুন্দর জলাভূমি যেন কাশ্মীরের ডাল বা উলার হ্রদের মত শোভাময়, কিন্তু এসব স্থানে টুরিস্ট ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটানোর শব্দ নাই, সুতরাং এমন সুন্দর একটি সৌন্দর্য্যময় স্থানে কখনো কেহ আসেনা।

সইমাদের গ্রামটিতে জঙ্গল তত নাই—ব্রাহ্মণপাড়ায় অনেকগুলি কোঠাবাড়ী, প্রায়ই সব চাষী গৃহস্থ, বড় বড় গোলা উঠানে, গোয়ালবাড়ী ভর্ত্তি গরু। একজনের উঠানে দোতলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে, উঠানের বাতাবী লেবু গাছের তলায় মজুরেরা দুমদাম শব্দে সুরকি ভাঙিতেছে। নীরেন সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চক্কত্তিদের বাড়ী যাব কোন্ দিকে?

একজন বলিল—কোন্ চক্কত্তি? অনেক চক্কত্তি আছে এ গাঁয়ে।

—৺ভুবনমোহন চক্কত্তি—

—সে ও পাড়ায়। ওই তেঁতুল গাছের পাশের রাস্তা দিয়ে যান—

আধঘণ্টা পরে সে সইমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পিঁড়িতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। নীরেন দেখিল তাহার সইমার বয়স খুব বেশি নয়, মাথার চুল এখনও একগাছি পাকে নাই, রং বেশ ফর্সা, দোহারা চেহারা, এক সময়ে যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও দেখিলে বোঝা যায়।

সইমা চোখের জল ফেলিলেন। অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাকা বেলের সরবৎ, মুগের ডাল ভিজানো ও আখের গুড় খাইতে দিলেন। সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল। সে সইমাকে কখনো দেখে নাই এর আগে। সইমা কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলেন সে যখন দুই বৎসরের খোকা, তখন। প্রৌঢ়া মহিলার বহু পুরানো দিনের শোকস্মৃতি উথলাইয়া উঠিল আজ তাহাকে পাইয়া। এমন কত লোকের নাম করিতে লাগিলেন যাহাদের কথা মায়ের মুখে আলিগড়ে নীরেন শুনিত বাল্যকালে—কত বাল্যস্মৃতিজাগানো নামাবলী। দেশের ঘরের সব লোকের নাম। বাঁচিয়া আছে কেউ কেউ এখনও—তবে বেশির ভাগই মারা গিয়াছে।

সইমা বলিলেন—তোর মুখে সইয়ের মুখ যেন মাখানো রয়েচে—

নীরেন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সই বড় সুন্দরী ছিল। গ্রামের কাজকর্ম্মে যখন সেজেগুজে নেমতন্ন খেতে কি বিয়ে থাওয়ায় জল সইতে যেতো তখন লোকে দু দণ্ড চেয়ে দেখতো। এদানি রোগে শোকে আর কিছু ছিলনা চেহারার। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কখনো দেখা হয় নি সইয়ের সঙ্গে। সে কতদিন হবে রে নীরু?

নীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—তা প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর হোল।

—সই মারা গিয়েচে কতদিন?

—বেশি দিন না, বল্লাম যে পছর পাঁচেক হবে।

—তাহোলে সই বেঁচে থাকলে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হোত—

—তা হবে, আমারও হোল ছাব্বিশ। আপনার ছেলেও তো আমার বয়সী হবে, না সইমা ?

সইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথায় ছেলে বাবা ? সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিযেচে অনেক কাল।

রাত্রে নীরেন খাইতে বসিয়াছে, সইমা সামনে বসিযা খাওয়ার তদারক করিতেছেন।

নীরেন বলিল—আপনার আর দিদিমার রান্না সমান। এমন রান্না অনেকদিন খাইনি।

সইমা বলিলেন—তোর মাও ভাল রাঁধতো রে—যখন কপাল পুড়লো, এ দেশ থেকে সেই পশ্চিমে চলে গেল, তখন সে কি কান্না! বলে—সই, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে ? এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। সে ভাগ্যিমানী স্বর্গে চলে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।

নীরেন হাসিয়া বলিল—আপনি না থাকলে আজ কার মুখ চেয়ে এখানে আসতাম বলুন সইমা ? সইমা দুধের বাটি নীরেনের সামনে রাখিযা পাখার বাতাস দিযা দুধ জুড়াইতে জুড়াইতে বলিলেন—তোকে যত্ন করবার দিন যখন আমার ছিল, তখন এলিনে। এখন কি আছে সইমার, কি দিয়েই বা তোকে যত্ন করবো ? হ্যাঁরে এতদিন পরে কি মনে করে এলি ঠিক বল্ তো ?

—বলি সইমা, আপনি বুঝতে পারবেন। জানেন, আমি দুবছর বয়সে বাংলা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম ?

—সে তো খুব জানি।

—আর কখনো এদেশে আসিনি এর মধ্যে ?

—তাও জানি।

—এতকাল পরে মায়ের ও বাবার বাক্সের কতগুলো পুরনো চিঠি পড়লাম

সেদিন। পড়ে মনটা বড় ব্যাকুল হল জন্মভূমি দেখবার জন্যে। সে সব চিঠিতে আপনার নাম আছে, আমার এক পিসিমার নাম আছে। আমি বাবাকে কখনো দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধে, আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে—আরও অনেক নাম আছে বাবার এক পুরানো খাতার মধ্যে—সকলের সম্বন্ধে আমার জানবার বড় ইচ্ছে হোল। আমি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত মামার বাড়ীর সকলকে দেখে আসচি, বাপের বাড়ীর বা নিজের বংশের কিছু খবর রাখি নে। সেই সব খুঁজে পেতে বার করবো বলেই এলাম।

—ওমা আমার কি হবে! কোথাকার পাগল ছেলে ছাখো—

—না সই মা, আপনি ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েচে কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের বংশের কোনো খবর রাখি নে। বাপের বাড়ীর কোন লোকের কথা জানি নে। অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে জানবার। আপনি হয়তো ভাববেন এ আবার কি, আমার কিন্তু সইমা ঘুম হয় না এই সব ভেবে—সত্যি বলচি—আপনি আমায় বলে দিন কি ভাবে আমি তা করতে পারি—আমি তো কাউকে চিনি নে—বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু কোনো খবর রাখি নে দেশের।

—সব বলে দেবো. এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো দিকি দুষ্টু ছেলে আমার!

নীরেন হাসিল। অনেকদিন পরে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই ধরনের হাসি সইমার মুখে। ভাগ্যিস সে আসিযাছিল। শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্ত্তিতে তাহাকে সস্নেহ অভ্যর্থনা জানাইতেছেন।

চৈত্র মাসের রাত্রি। হু হু দক্ষিণ হাওয়া খোলা জানালা দিয়া বহিতেছে। কি একটা ফুলের তীব্র সুবাস বাতাসে। নীরেন বাংলাদেশের অনেক কিছু গাছপালা চিনে না—কিন্তু তাহার কি ভাল লাগে এই সব পল্লীগ্রামের আগাছা জঙ্গল! আজ দুদিন তিন দিন মাত্র ইহাদের সহিত পরিচয়—তবুও যেন মনে হয়

কত দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তাহার শিরা-উপশিরার রক্তের সহিত আবদ্ধ ইহাদের প্রাণস্পন্দন। এই সব বনস্পতির সহিত সেও একদিন এই তাহার প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে জন্মিয়াছে।

সে একখানা খাতা আনিয়াছে সঙ্গে।

খাতাখানা তাহার পিতামহ ৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত। তাহাদের গ্রামের কত প্রাচীনদিগের তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনা ইহাতে কেন যে তাহার পিতামহ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসে কার কি ফল? অমন কত গ্রাম, কত অগুন্তি গ্রাম বাংলা দেশে। কে জানিতে চাহিতেছে তাহাদের ইতিহাস? গরজই বা কাহার?

আজ রাত্রে আলোর সামনে বসিয়া খাতাখানা সে খুলিযা দেখিল। সইমা তাহার বিছানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গিযাছেন। ঘরে সে একা। মাটির ঘর। ছোট জানালা, কাঠের গরাদে। জানালার বাহিরে একটা কি গাছে থোকা থোকা গাদা গাদা ফুল ঝুলিতেছে—কতক ফাটিয়া তাহাদের ভিতরকার রাঙা রাঙা বীচি বাহির হইয়াছে—দিনমানে নীরেন লক্ষ্য করিয়াছিল।

খাতার পাতায় লেখা আছে—

"২২শে চৈত্র। ১২৭২ সাল……"

এইটুকু পড়িয়াই নীরেন অবাক হইয়া যায়। কত কালের কথা! ১২৭২ সালেও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, এমনি বসন্ত নামিত এ পাড়াগাঁয়ের বনবুকে, এমনি কোকিল ডাকিত রাত্রি দিনে? সে তখন ছিল কোথায়? কোন্ অতীত দিনের কাহিনী এ সব?

মনে পড়ে আলিগড়ে তাদের দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া এই ডায়েরির পুরাতন তারিখগুলো সে পড়িয়া বিস্মিত হইত—কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময় ও রহস্যের অনুভূতি আজ তাহার মনে।

তারপর লেখা আছে, 'আজ রামলোচন রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উহাদের আমবাগানে হারাধন মুস্তফির সহিত ধরা পড়িলেন। ইহা লইয়া আজ জ্যাঠা-মশায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সারাদিন ড'মাডোল চলিতেছে। রামলোচনের স্ত্রী বলিযাছেন তিনি নিদ্দূষি। আমেব গুটি ঝড়ে পড়িতেছে, তাহাই কুড়াইতে গিয়াছিলেন, হারাধন মুস্তফির কথা কিছু জানেন না। আজ রামলোচন রায়ের স্ত্রীকে দেখিয়াছি। বয়স হইলেও চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। খুব সুন্দরী। বুমোরের বৌ ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।'—

নীরেন এই ডায়েরিটুকু পডিয়া কতবার মনে মনে হাসিয়াছে।

পিতামহ গদাধর মুখুয্যে বহুকাল সাধনোচিত ধামেই সম্ভবত প্রস্থান করিয়াছেন, নীরেনের মায়ের বিবাহ তখনও হয় নাই। সে পিতামহের কার্য্যের সমালোচনা করিতেছে না, তবুও মনে হয় এই বুম্ভকাব বধূটির এইখানে উল্লেখ থাকার কারণ কি? বিশেষ করিয়া ঠাকুরদাদা ইহারই নাম করিলেন কেন? গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া? না—

হায় রে সে ১২৭২ সাল! আজ রামলোচন রায়ের নিরপরাধা সুন্দরী পত্নী যিনি নির্জ্জন দুপুরে বাগানে আমের গুটি কুড়াইতে গিয়া হারাধন মুস্তফির সঙ্গে নিজের নাম যোগ করিবার সুযোগ দিয়া মিথ্যা কলঙ্ক কুড়াইয়াছিলেন একদিন প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বের এক সুমধুব কোকিলমুখবিত, পুষ্পসুবাসামোদিত, প্রেমোচ্ছল বসন্তদিনে—কোথায় তিনি আর কোথায় তাঁহার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী সোনা বুম্ভকারের রূপসী বধূ? আজ এই সব পল্লীগ্রামের মাটিতে তাঁহাদের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াই যাইত যদি না তাহার পরোপকারী পিতামহ গদাধর মুখুয্যে এত ঘটা করিয়া উক্ত বধূদ্বয়ের ইতিহাস তাঁহার ডায়েরিতে নিঃস্বার্থ ভাবে না লিখিয়া রাখিতেন!

হাসি পাইবার কথাই তো।

নীরেন ডায়েরি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার বংশের

পূর্ব্বপুরুষেরা যেন ভিড় করিয়া আশেপাশে তাঁহাদের অদৃশ্য অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার জন্যই তো সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলাদেশে তাহার জন্মভূমি অঞ্চলে আসিয়াছে এত কাল পরে। তাঁহারা ঘুমাইতে দিবেন না।

সকালে সইমা ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন—ও নীরু, ওঠ বাবা, বেলা ঝাঁ ঝাঁ করচে—

নীরেন ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

সইমা বলিলেন—তোর আবার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, না ?

—ছিল তো সইমা।

—এখানে কি করি উপায় তাই ভাবচি—

—ভাবতে হবে না। এখানে না হোলেও চলবে।

—তা কি হয় বাবা ? দেখি। যার যা অভ্যেস—

—না সইমা, কিছু চেষ্টা করতে হবে না। তা হলে আমি দুঃখিত হবো।

সইমা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া তাহার সামনে রাখিলেন এবং একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি। রায়বাড়ী হইতে চা চাহিয়া আনিয়াছেন, সেখানে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চা খায়।

নীরেন চা পাইয়া মনে মনে খুশি হইল। মুখে বলিল—কেন বলুন তো এ সব—পরের বাড়ী থেকে আনতে যাওয়া ?

সইমা বলিলেন—তোর মা থাকলে করতো না ?

—তা কি জানি।

—করতো রে করতো। শুনবি তোর মায়ের কথা ?

—কি, বলুন।

—তোর মা বড্ড শান্ত ছিল।

—মাকে আমি দেখেচি, শান্ত ছিলেন সবাই বলতো।

—একবার সই আর আমি নাইতে গিয়েচি ঘাটে। সাঁতার দিয়ে দুই সই মিলে নদীর মাঝখানে গিয়েচি। এমন সময় ঘাট থেকে কে চেঁচিয়ে বল্লে নদীতে কুমীর এসেচে। আমরা তো তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় সইকে আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সই যত বলে ছাড়ো ছাড়ো দুজনেই ডুবে যাবো, আমি ততই ভয়ে সইকে জড়াই।

নীরেন রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল—তারপর ?

—তারপর আর কি ? দু জনেই বেঁচে উঠলাম, একখানা নৌকো আমাদের ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—তখন আপনারা একগ্রামেই থাকতেন ?

—হাঁবে, নইলে আর সই বলবো কি করে। পাগল ছেলে আর কি ! কথাটা নীরেন সন্ধ্যাবেলা তাহাব খাতায় লিখিয়া রাখে।

গ্রাম্য জীবনের কোন কথা সে বাদ দিতে চায় না। মরুপর্ব্বত ভেদ করিয়া সুদূর পাঞ্জাব হইতে ছুটিয়া আসা (কোন কটাক্ষ কেহ করিবেন না) তবে কিসের জন্য ?

সইমার শ্বশুরবাড়ী এটা। কিন্তু একটি দেওরপো ছাড়া এখানকার বাড়ীতে কেহ থাকে না। দুটি দেওর বাহিরে চাকুরী করে, সেখানেই পরিবার লইয়া থাকে ; যে দেওরপো এখানে আছে ওটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ। জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হইতেছে। জ্যাঠাইমা ভালও বাসেন।

দেওরপোর নাম কানু। কানু নীরেনকে খুব ভাল চোখে দেখে নাই। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে ইনি আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন ! কেন রে বাবা। যে তিন বিশ ধান হইয়াছিল, ইনি এখানে আসিলেন,—তাহাতে ক'দিন যায় ? জ্যাঠাইমাও দেখিতেছি নীরু বলিতে অজ্ঞান।

কানু আসিয়া বলিল—যাত্রা দেখতে যাবেন ?

—কি যাত্রা ?

—এই দিগি—গোনাই যাত্রা ?

—সে আবার কি ?

—দেখবেন এখন। দিন দিখি একটা টাকা চাঁদা। নীরু একটা টাকা বাহির করিয়া কানুর হাতে দিল।

গোনাই যাত্রার আসরে বসিয়া নীরেন যাত্রা তত দেখে নাই, যত সে এই সুন্দর রাত্রিটি ও যাত্রার আসরের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়াছে। যেখানে যাত্রার আসর, সেটা ছোট একটা মাঠ, তার চারিপাশে বনজঙ্গল, একদিকে বনের প্রান্তে একটা কামারের দোকান, সেখানে এখনও হাপরে আগুন জ্বলিতেছে। বাঁশের খুঁটিতে পাল টাঙানো হইয়াছে। পান বিড়ির দোকান বসিয়াছে, চাষা লোকে যাত্রা দেখিতে আসিয়া পানের দোকানের সামনে ভিড় করিতেছে। একটা মুচুকুন্দ চাঁপার গাছতলায় ফুল পড়িয়া বিছাইয়া আছে। বাতাসে মুচুকুন্দ চাঁপার সুবাস।

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছিল গোনাই বিবি। তারই সুখ দুঃখের কাহিনী। নীরেনের পক্ষে এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু যারা শ্রোতার দল, তাদের সারারাত্রি জাগিয়া দেখিবার বস্তু। ভ্রাতার বিরহে কাতরা তরুণী গোনাই বিবির সে করুণ গান, 'ও বছির, বছির রে, বৈঠা হাতে নিলি রে' অনেকের চোখে জল আনিয়া দিল।

নীরেন ভাবিতেছিল বহুদূরের লিপুলেক গিরিবর্ত্মে বরফ গলিয়াছে। দলে দলে ঝব্বুর পিঠে বোঝাই দিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে। গুরেলা মান্ধাতার তুষারাবৃত শৃঙ্গ সায়াহ্নদিনের সূর্য্যকিরণে সোনার রং ধরিয়াছে। তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু করালীচরণ মজুমদার সস্ত্রীক এই মাসের শেষে মানস সরোবরে রওনা হইবেন, সঙ্গে যাইবেন নীরেনের দিদিমা ও বড় মামীমা, বাড়ীর গোমস্তা নাদু চক্কত্তি। আলিগড় হইতে আলমোড়া।

আলমোড়া হইতে ধারচুলা। ধারচুলা হইতে লিপুলেক পাস। লিপুলেক হইতে মানস সরোবর। সে নিশ্চয় যাইত ওখানে থাকিলে।

কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নাই।

বাংলাদেশে সে আসিয়াছে মাতৃভুমির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সন্ধানে। গাছপালায় পাখীর কাকলীর মধ্যে দিয়া সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। ঐ মুচুকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্ব্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে সে দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।

পরদিন গ্রাম্য নদীর ধারে একটা বড় নিমগাছের তলায় সে দাঁড়াইয়া।



✓কম্পিটিশন

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু'দফা ফোন করলেন। একবার অ্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্তা হরিদাস বড়ালকে; কারণ ওদের আপিস এখনো খোলেনি।

—নমস্কার, কি খবর?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন?

—আসবো এখন?

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ীর বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোলিও ব্যাগ।

—আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর?

—তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না?

—রেজেষ্ট্রী আপিস সার্চ্চের রেজাল্ট কি?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেণ্ট।

শিবশঙ্কর বাবু হরিশ মুখুয্যের ষ্ট্রীটে তিনতলা বড় বাড়ী কিনচেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, অ্যাটর্নিরা তিন পার্সেণ্ট কমিশন নেবেন—আসল কথা হচ্ছে এই। রূপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ ও লেটুস সেদ্ধ এল, তার সঙ্গে চায়ের লিকার, দুধ আলাদা, চিনি।

শিবশঙ্কর বাবু বল্লেন—মিষ্টি দিইনি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না। থাক। তারপর আমার গাড়ী রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

—বেড রুম কতগুলো?

—উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছ'টা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ী। কুণ্ডু কোম্পানীকে রাজি করতে বেগ পেতে হয়েচে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

—এখন যেতে পারবো না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্য্যন্ত মরবার ফুর্সৎ নেই—এক্ষুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হোল।

—নমস্কার, কি খবর? হ্যাঁ, একবার করেছিলাম—হ্যাঁ—এই আধ ঘণ্টা আগে। হ্যাঁ। সোনাটার কি হোল? বারের দাম কত বল্লেন? তিন আনা? আমার চাই কিছু—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আচ্ছা। আজ?…হ্যাঁ—আচ্ছা। আপিসে? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্ত্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত সুবর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের অফিস ম্যানেজার ও তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা সুরু হোল তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেণ্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেণ্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ

সম্বন্ধে শেয়ালদ' স্টেশনের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বল্লেন—তা হোলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার ?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেণ্ট করতে হবে, আর পূজোর ব্যবস্থা —তাও তিন হাজার নেবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্ম্মণকে একটা প্রেজেণ্ট দিতে হবে ভাল দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন।

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েচে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন ?

—আচ্ছা, গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বদ্রিদাসের বাড়ী। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ী যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ী নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক্ ভাঙাও। ওখান থেকে ইষ্টিশানে চলে যাও—গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্ম্মণকে খুশি রাখা চাই মোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পূজো না দিলে হয় না। কমপিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। এক গাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বল্লেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—ছোট বৌমার—ওপরে দিগে যা! আর শোন্—বলে আয় আমি চান করবো এখুনি।

খাবার ঘরে বড় পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরেপাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বল্লে—ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা?

—তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ অ্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েচে। কেন?

পুত্রবধূ হেসে বল্লে—আমরা ভাবচি বেহালা যাবো পিকনিক করতে। গাড়ীখানার দরকার ছিল—

—ও। তা—কটার সময় যাবে। গাড়ী না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌছে গাড়ী ছেড়ে দিও—বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বল্লে—তা তো জানিনে বাবা।

—তার মানে? বেরিয়েচে?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ী আসেন নি।

—সে কি কথা! কালও আবার আসে নি—হুঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বল্লেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরাণী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করচে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর

সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েছেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাড়ে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রী করেন। চালের কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপরে সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো কাজ করেন নি তা নয়। দেশের বাড়ীতে 'প্রায় দু'হাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েছেন, কাপড় বিতরণ করেছেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেছেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ'লক্ষ টাকা ঘরে এনেছেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে, এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের বহু গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্ব্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মারকেট থেকে সর্ষে পর্য্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর! চরকির মত ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতী গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুর্ব্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারী সে এ সব মানবে না। কম্‌পিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না

যে পূজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শো-পচারে পূজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্যি—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাবো, এত বড় পদস্থ লোক—পূজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বল্লাম, বেশি আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটেনি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কর বল্লেন—কি খবর? আসুন, বসুন।

—বড্ড বেশি চায়।

—কত?

— সাড়ে পাঁচ কোরে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—জমি কার? ব্যাঙ্কের?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিষ্ট্রী আপিস সার্চ্চ করা হয়েচে।

—বড় বেশি দব বললে না?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্য্যন্ত উঠবে। ন' কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায়না স্যার। আপনি কাল নিজে একবার চলুন—বায়নাপত্তর রেজেষ্ট্রী না করলে দু তিনটে খদ্দের মুখিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে সামনের লোকটিকে বল্লেন—অ্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটের বাড়ীটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়ীটা দেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হোয়ে সোজা হরিশ মুখুয্যে স্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্ব্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ীর ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হোল। মিঃ ঘোষাল বল্লেন—মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পার্সেণ্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা সর্ত্ত। নয়তো আমারই হাতে দুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি—কিন্তু এখানে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ী—

—ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে যা খরচ পড়বে তা তো আপনি এমনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ী কি দুইএর কমে হয়—চার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মাড়োয়ারি খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকব কারুয়া বল্লে—হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েচে। হামি নম্বর লিয়ে রাখিয়েসে।

—কই নম্বর?

—হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মনু বাবুকে দিয়ে লিখিয়ে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়ালা চা জলদি তৈরী কর—

—আউর কুছ্ বাবু?

—আজ বাড়ি থেকে টিফিন আনেনি কেউ? ফলটল?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়ালা—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়ীতে ছিল, এখন কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেচেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুখ দিয়ে শিবশঙ্কর বাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছেন।

শিবশঙ্কর কাগজকলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জাম কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হোলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেণ্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্কর বাবু ড্রয়ার খুলে অর্দ্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্দ্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুমারডি কয়লাখনির এক তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ি, রেলের ওপারের বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইটি বড় মৌজা নীলামে উঠেচে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে।

লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকী খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারীবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে ৺মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগান-বাড়ী ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ী।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশী শিবশঙ্করের। দু' পার্সেণ্টের অনেক বেশী আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্ছেন।

আর বাকী সব পাড়াগেঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই—বাড়ী বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ভালো, ফলবান গাছ অনেক-গুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু'চার বছর পরে। দালালে বলচে আটষট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর ফেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ী। অবিশ্যি নিতান্ত গরীব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই

ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয় নি, লেক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ী করবার সখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্ণমেণ্ট এ বছরেই শোধ করে। পূজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চট্‌পট্ হয়ে যাবে। শিবশঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি। অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা···টাকা····চাই, টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধেব বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে···যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয় নি। অনেক কিছুই বাকী।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাডী আসে না। নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের। ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনও তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড বৌমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নিব ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হোতে পারতো না। যত নির্ব্বোধ নিয়ে হযেচে তাঁর সংসার।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে। —হ্যাঁ, কে? ও আচ্ছা—বেশ, বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি সৌখীন বাবুমত লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের

দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক সুরে ফিরে এসে বল্লে—বেশ, যাই তা হোলে।

—বোসো, বোসো—

—বুঝতে পারলে না? সামলে রাখতে বলিগে যাই। সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে ঠেলে, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না? ঠিক আটটাতে—

বেলা ছ'টার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়ীমে ধাক্কা মৎ লাগে—

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর' বলে শোভা সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাক্সি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। আগের সৌখীন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বল্লে—এসো ভায়া, এসো—চা খাবে না?

—আর এখন চা নয়। চলো—

এখনো দেরী আছে। আমি কাপড় পরে নি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ী নিয়ে চল্লেন—বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বল্লে—আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশী নয়। নিজের চোখেই ছাখো ভায়া, এ শর্ম্মার নাম গোপাল চক্কোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো—তুমি শুধু দেখে যাও—সিনেমাতে আজকাল নাম কি! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশঙ্কর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বল্লে—ওই দ্যাখো, যত সব ছেলে ছোকরার মরণ—সিনেমার হিয়ে কিনা? আসল কমপিটিশন্ হচ্ছে এদের কাছে টাকায—সে কমপিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম্ম নয়—ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোল?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

/ ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই? আপনার দুটো মনিঅর্ডার আছে, ভাবলাম আগে বিলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসৎ পাবেন না হয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশটাকা আর আটাশটাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবিশ্যি। কোর্টের খরচা। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—ত্যাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিন মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা ৺রামলাল চক্রবর্ত্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরী ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলা-ধূলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব হুশিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরৎ দিন মনিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দুটাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো ?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা—

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজ্‌ড'। অন্যটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু, বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ী নেই। বেড়িয়ে ফেরেননি এখনো। মা ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ ? আঃ বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এদিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি ?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড সংসাবে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা ? আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে। আপনারা খাবেন না ? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎ বাবু উকিলের বাড়ী কি এডা ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আর্জ্জি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস্ ? কোথায় বাড়ী ?

—বাবু, আমার বাড়ী রাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ী ন'হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মক্কেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া বিজন মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে?

– হ্যাঁ বাবু!

—কত টাকা? আরজি করার ফি ছ'টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু ঝা লাগে—আমাদের শুনুন তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্তি বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্ব্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোন সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার জন্য তোমরা যে ২॥৵০ প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্ত্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাথমহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়া মহাশয় রামধন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি পায়ে

আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধূমাতাদের আশীর্ব্বাদ জানাইবা।

ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীহরিসাধন দেবশর্ম্মা

সাং বাহিরগাছি। বর্দ্ধমান জেলা।

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে?

—এই দেখো হরি ভটচাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে, ছ' টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপূজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও! ঠাকুর-পূজোতেও ব্ল্যাক্ মার্কেট! দয়া করে তো টাকা দিচ্চি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়ীতে আছে। ও টাকা তো ষ্টাইপেণ্ডের সমান দি[illegible] আমরা। বেশ, না পূজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দুমাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু' মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্ব্বাদমস্তু রাশয় বিশেষঃ

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাপাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্য যে ২৷৷৶০ করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্ত্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা

পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। পত্রপাঠ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্ব্বাদ দিবা।

ইতি
নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীহরিসাধন দেবশর্ম্মা
সাং বাহিরগাছি, বর্দ্ধমান জেলা।

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাইসি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েচে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপূজোয়।

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে? কত নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ সৌখীন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বলো তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ ছ' টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যের পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরির আঁজি ছাখো—

এই সময়ে দাদাও আসিলেন। দুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর ক্রয়-নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

তুচ্ছ

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাটচি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়িতে ঢুকলো। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে এ'কে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েচে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢল, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে ?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বল্লে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশুর মেয়ে ? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ি ?

মেয়েটির খুব লজ্জা হোল শ্বশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বল্লে—নারানপুর।

—কোন্ নারানপুর ? ঘিবে-নারানপুর ?

—হ্যাঁ।

—কদ্দিন বিয়ে হয়েচে ?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি কবে ?

—পরশু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ির মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ি এসেচে, এ পাড়া ও পাড়ায় সব বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হোল খুকিটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা !

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বল্লে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটো কথা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বল্লুম—হ্যাঁ আমার ছবি।

—কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেমব্রাণ্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

—ও মেমসায়েব কি করচে কাকাবাবু?

—সিগারেট খাচ্চে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

—মেমসায়েবরা খায়। দেখেচিস্ কখনো মেমসায়েব?

—হুঁ।

—কোথায়?

—রানাঘাট ইষ্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়িতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্চে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম

ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ির মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘসা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোল। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য্য ঠেকেচে, খুকির চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোল ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশি আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পা'o়া যায় না বলে বাড়ির মেয়েদের ফরমাজ মত গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বল্লাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকি?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল! এমন কথা কেউ ওকে বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ির কর্ত্তা তো নয়ই।

বল্লে—হঁ্যা!

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাক্‌তর করে দিয়ে আমি নিজের

হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেসে ফেল্লে। অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বল্লাম—কি রকম গন্ধ ?

—চমৎকার, কাকাবাবু!

—কি তেল বল দিকি ?

—জানি ?

—খুব ভাল গন্ধতেল।

ভারি খুশি হয়েচে ও।

বল্লে—আসি তা হোলে কাকাবাবু? বেলা হয়েচে।

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্য্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

পিদিমের নীচে

একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরণের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। কেউ তার জীবনচরিত লেখেনি, কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখে রাখলাম।

আমার ছেলেবেলায় দিন কতক মাসীর বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম সে গ্রামে। আমার তখন বয়স ন' দশ বছরের বেশী নয়।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে একদিন মাসতুতো ভাই নন্দর সঙ্গে পাশের গ্রাম আমিনপুরে চাল আনতে যাচ্ছিলাম। বিকেল বেলা, বর্ষা কাল, গঙ্গার জলে খুব ঘোলা এসেচে, জল বেড়ে সাতনলির বড চড়া ডুবে গিয়েচে, ঝিঙে পটলের ক্ষেত জলের অত্যন্ত ধারে এসে পড়েচে।

হঠাৎ নন্দ আমায় ধমক দিয়ে বল্লে—এই, সরে আয়।

—কি রে?

আমার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে ঝুপ করে অনেকখানি পাড় ভেঙে পড়লো অনেক নিচে ঘোলা জলের আবর্ত্তের মধ্যে। আমার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো।

নন্দ বল্লে—এখুনি গিইছিলি যে।

সত্যিই তাই। আর একটু হোলে আমি গিয়ে পড়তাম গঙ্গাগর্ভে। তখন সাঁতার জানতাম না। জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় ছিল না। আমার বড় ভয় হোল, গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়েই রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েচে! যদি আবার পাড় ভাঙে, বিশ্বাস কি।

নন্দকে বল্লাম—নন্দদা, আমি যাবো না, তুই যা। আমি বাড়ী যাই—বলেই স্বীকার করতে এখন লজ্জা হয়, কেঁদে ফেললাম।

নন্দ কাছে এসে বল্লে—ওই ছ্যাখো, নাও, কেঁদে উঠলি কেন? কি মুস্কিলেই পড়া গেল ছ্যাখো। বাড়ী যেতে পারবি নে একলা। চল্ তোকে পাগল ঠাকুরের আস্তানায় রেখে আসি।

এইভাবে এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো।

এ অঞ্চলে আমি আছি আজ মাস দুই। পাগল ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে আসচি এতদিন। শুনেছিলাম প্রথম আমার মাসিমার মুখে। আমি বলেছিলাম—সে কে মাসিমা?

—গঙ্গার তীরে থাকে। সাতনলির চরের এপারে।

—কে সে?

—জেতে বুনো। ওখানে আস্তানা করে আছে ঘর বেঁধে আজ বিশ ত্রিশ বছর। আমার তো বিয়ে হয়ে এখানে এসে এস্তক শুনে আসচি। অনেক ছোট জেতের গুরুদেব। মাঘ মাসে তার ওখানে মেলা বসে, লোকজন আসে, দোকান পসার জমে।

—আমি একদিন দেখতে যাবো?

—না, যায় না। বুনো বাগ্দি, ছোট জেতের কাণ্ড, সেখানে কি দেখতে যাবি তুই? ছুলে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুদ্ধু হয় না।

সেই বিকেলে আমার মাসতুতো ভাই নন্দ আমায় পাগল ঠাকুরের আস্তানায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। বল্লে—ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বসে থাকবি—

একটা বাবলা বনের মধ্যে দু'খানা খড়ের ঘর। একটা ছোট গোয়াল ঘর, তাতে দুটি গাই-গরু বাঁধা। একখানা ঘরের দাওয়া অত্যন্ত নিচু, সেখানে খানকতক পিঁড়ি আর খেজুরের চেটাই পাতা। বাবলা গাছে ফুল ধরেচে, ফুল ঝরে ঝরে নিকোনো পুছোনো পরিষ্কার উঠোনটা ছেয়ে রেখেচে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোয়াল ঘরে ঘুঁটের সাঁজাল দিচ্ছে। আর কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় একটি লোক বাবলা বনের ওধার থেকে বড় ঘরখানার দাওয়ায়

এসে একখানা দা রেখে দিলে। তার কাঁধে এক বোঝা সবুজ জোলো ঘাসের আঁটি। লোকটার লম্বা দাড়ি বুকের উপরে পড়েচে, মাথায় লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল, পরনে অতি মলিন এক কাপড়—দেখে পাগল বলে মনে হয়।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে বল্লে—কে ওখানে? কে গা?

আমার ভয় হয়েচে। আমি আমতা আমতা করে বল্লাম—এই—এই—ওই আমার মাসীর বাড়ী—

সেই বৃদ্ধা বল্লে—বাঁওনদের ছেলে। বোধ হয় বাবুদের বাড়ীর। ভূপেনবাবুর নাতি নন্দ বসিয়ে রেখে গেল। ভয় কি খোকা? ভয় কি? শসা খাবা?

শসা খাবো কি, লোকটার হাবভাবে ও রক্তবর্ণ বড় বড চোখ দেখে আমার প্রাণ তখন উড়ে গিয়েচে। আমি কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। দস্যু-ডাকাতের গল্প শুনেচি, সেই দস্যু-ডাকাতদের একজন নয় তো?

হঠাৎ লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বল্লে—ভয় কি, বাবাঠাকুর? ভয় কি? কিছু ভয় নেই। বোসো।

তারপর একেবারে কাছে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্নেহের হাসি হেসে বল্লে—আহা, বালক!

আমি চুপ করে বসে আছি। বোবার শক্র নেই।

লোকটা বল্লে—নাম কি বাবাঠাকুর?

ভয়ে ভয়ে বল্লাম—পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়—

—পতিতপাবন? বাঃ, বেশ, বেশ। পতিতপাবন যিনি, তিনিও তোমার মত। আহা-হা! আহা!

লোকটা শেষের কথাগুলো কাঁদো কাঁদো সুরে জোরে জোরে উচ্চারণ করলে। তারপর বল্লে—ওগো, পতিতপাবনের ভোগ দেবে কি দিয়ে? আমার বাড়ী এসেচেন দয়া ক'রে, সে অদৃষ্ট করিনি যে বাবাঠাকুর। তোমার ও মুখে কি তুলে

দেবো? পাকা তাল একটা নিয়ে যাও—তালের বড়া ভেজে দিতে বোলো তোমার মাসিমাকে—

আমার কথাগুলো ভাল লাগলো এবং ভয়ও অনেক চলে গেল। কিন্তু ওর রকম সকম দেখে মনে হোল লোকটা পাগল ঠিকই। তাই ওকে পাগল ঠাকুর বলে।

পাগল ঠাকুর ছোট ঘরটার দাওয়ায় গিয়ে বসে আমায় কাছে ডাকলে। হাতছানি দিয়ে বল্লে—এসো পতিতপাবন, এসো, এসো—

বৃদ্ধা বল্লে—ওকে ডেকো না, ভয় পেয়েচে।

কিন্তু আমি সম্প্রতি নির্ভয় হয়েচি দেখাবার জন্যে পাগল ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম। পাগল ঠাকুর একখানা খেজুরের চেটাইয়ের উপর বসে এক কল্কি তামাক না গাঁজা কি সাজলে। আমায় বল্লে—তুমি বাঁওন?

—হ্যাঁ।

—পায়ের ধূলো দেবা একটু?

—আমায় ছুঁয়ো না। মাসিমা বারণ করেচে।

পাগল ঠাকুর হেসে উঠে বল্লে—কেন, নাইতে হবে বুঝি? তা আমায় ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে না। আমি বাঁওন নই, কিন্তু দয়াল গুরুর নামে থাকি। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। দাও, পায়ের ধূলো—

পাগল আমার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কি যেন একটা অদ্ভুত ভাব হোল। একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব, সে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, বিশেষত তখন আমি বালক, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখবার ক্ষমতা ছিল না। এখন এক একবার ভাবি, পাগল ঠাকুরের পায়ের ধূলো নেওয়াটা হয়তো একটা ছুঁতো—আমাকে স্পর্শ করবার জন্যেই ও পায়ের ধূলো নিতে চেয়েছিল।

তারপর ও একটা গান করলে। গান আমার মনে নেই, কিন্তু বেশ গলার

সুর ওর। গান গাইতে গাইতে ওর চোখে জল এল, গাল বেয়ে জল পড়তে লাগলো। "ও আমার হৃদ্-কমলের পরমগুরু সাঁই"—এই কথাটা বার বার ছিল গানের মধ্যে।

গান শেষ করেও বার বার বলতে লাগলো—কিছু খাওয়াতে পারলাম না, বাবাঠাকুর। একটা পাকা তাল নিয়ে যাও, বড়া করে দিতে বলো তোমার মাসিমাকে।

আমার ভয় এখন সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছিল। আমি বল্লাম—তুমি কি কর এখানে?

পাগল ঠাকুর হা হা করে হেসে উঠে আমার দিকে চাইল। তারপর সস্নেহ সুরে বল্লে—বাবাঠাকুরের কথা শোনো। হাসতে হাসতে মরি যে! খুব আনন্দ জুটিয়ে দিলেন আজ সন্দেবেলা গুরুগোসাঁই। বলে কিনা—কি কর? আমি এখানে থাকি বাবাঠাকুর। আর কি করবো? গুরুগোসাঁইকে ডাকি।

—কে সে?

—ওই, ওই—

পাগল আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—উনি।

আমার খুব ভাল লাগছিলো এই অদ্ভুত লোকটাকে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি, দেখলাম। এই সময় সন্ধ্যের অন্ধকার নামলো। গায়ের রোঁয়া আর দেখা যায় না। ও উঠে দোরে জল দিয়ে ধুনো জাললে। উঠোনের একটা ইটের মত উঁচুমত জায়গাতে প্রদীপ নিয়ে গিয়ে রেখে দিলে। আমি বল্লাম—তোমাদের তুলসীগাছ নেই?

—কেন বাবাঠাকুর?

—আমাদের বাড়ী আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্দেবেলা।

—তুলসী রাখিনে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোসাঁই ওই পিঁড়িতেই আছেন। তুলসী কি হবে?

—তুমি পূজো কর না বুঝি? তুলসী পাতা না হোলে পূজো হয় না।

পাগল ঠাকুর হেসে বল্লে—হয় বাবা, হয়। কেন হবে না? সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পূজো হয়। তবে পূজো-আচ্চা আমি করিনে বাবা।

—কর না?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তেনার পূজো কি কত্তে পারি আমি? গুরুগোসাই পাবে রাখেন যদি তবে আর পূজোর দরকার কি? ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করবে তোমরা—বাঁওনেরা। আমাদের ছোট জেতের হাতে ও সাজে না। পূজো কত্তে নেই আমাদের।

—তুমি তো ভাল লোক।

—কে বল্লে আমি ভাল লোক?

—সবাই বলে, আমি শুনিচি।

—তুমি যখন বলচো বাবাঠাকুর, তখন ভালই হবো।

এই সময় আমার মাসতুতো ভাই ফিবে এসে আমায় ডাক দিল, তার সঙ্গে আমি বাড়ী চলে গেলাম। বাড়ী যাওয়ার আগে ওরা আমাকে তাল দিলে, শসা দিলে, আবার আসতে বলে দিলে।

পাগল ঠাকুরের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখার পরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। মাসিমার বাড়ীর সেই গ্রামে আমাব যাওয়া ঘটেনি এই পাঁচ বছরের মধ্যে।

১৯১৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে ইস্কুলের ঝক্কি কিছুদিন এড়াবার জন্যে চলে গেলাম আবার মাসিমার বাড়ী।

মাসিমা বল্লেন—এসো, এসো বাবা। বুড়ো মাসীকে ভুলেই গেলে। থাক্ —থাক্—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

আমার মনে আছে, দু'একটা কথার পরে আমি বুড়ীকে জিগ্যেস করলাম - মাসিমা, সেই পাগল ঠাকুর আছে তো?

মাসিমাকে বুড়ী বল্লাম বটে কিন্তু তিনি সত্যিকার বুড়ী এখনও ঠিক নন। যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। আমি যখনকার কথা বল্‌চি তখনও তিনি তত মোটা হন নি, বেশ দোহারা, সুঠাম চেহারা, ফর্সা রং, বড় বড় চোখ। মাথার চুল কেবল ছোট ক'রে ছেঁটেছিলেন বিধবা হওয়ার পর। দেহে জরার আক্রমণের কোনো চিহ্ন তখনো স্পষ্ট ওঠে নি। তার ওপর মাসিমা ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের ঘরের বধূ। চাল চলনে একটা সেকেলে বনেদি ও স্পর্শ-ভীরু ঈষৎ গর্ব্বিত আভিজাত্য সদা-সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকতো। মাসিমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্লেন—কে? ও সেই পাগল ঠাকুর—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কেন, তার খোঁজে তোমার কি দরকার?

এখানে 'তোমার' কথাটার প্রয়োগ যে বিরক্তিসূচক তা আমার বুঝতে দেরী হোল না। মাসিমা জমিদারের বাড়ীর বৌ। তাঁর বোনপো যে তাঁদেরই গ্রামের এক ছোট জাতের গুরুর সঙ্গে মিশবে এটা তাঁর ভাল লাগলো না। অবিশ্যি এটুকুও বলা উচিত যে, তাঁরা নামেই তখন জমিদার, কিছুই ছিল না তখন, সংসারে বিষম টানাটানি চলছিল, তাও জানতাম। নতুবা নন্দ জমিদারের ছেলে হয়ে কাঁটাদ'র হাট থেকে বেগুন বয়ে আনবে কেন ফি হাটে?

মাসিমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—আমার কোনো দরকার নেই সেখানে। সেবার আলাপ হয়েছিল, তাই বেঁচে আছে কি না জানতে চাইচি।

—বাঁচবে না তো যাবে কোথায়?

—মেলা হয়?

—পাগল ঠাকুরের মেলা? কেন হবে না, যত বেটা বুনো বাগ্দির গুরুদেব, শুধু ব্যাটারা এসে পায়ের ধূলো নেয়, হৈ হল্লা করে। ঝাঁটা মারো! গুরু—গুরু! গুরু এমনি গাছের ফল কিনা!

আমি কিন্তু বিকেলেই পাগলঠাকুরের বাড়ী গিয়ে হাজির। সেবারকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার বালক-মনে একটি রহস্যজনক স্থান অধিকার

করে আছে তখনও। আবার তাদের সেই তুখানা খড়ের ঘর, নিকোনো পুছোনো গোবর-লেপা উঠোন, ঝিঙের-ফুল-ফোটা গঙ্গার তীরে অপরাহ্ণ শোভা কতকাল পরে দেখলুম।

পাগল ঠাকুরের দাড়ি আরও শাদা হয়ে নারদ মুনির মত দেখতে হয়েচে। তবে বার্দ্ধক্যজনিত কোনো শীর্ণত্ব বা দৌর্ব্বল্য নেই শরীরে। খুব শক্ত সমর্থ, লাঠি লাঠি চেহারা। মুখে সেই হাসি। এবার আর আমি নিতান্ত বালক নেই। অনেক জিনিস বুঝি। আগের ভয় আর নেই।

বল্লাম—তোমাকে বড় ভাল লেগেছিল সেবার—বড্ড মনে হোত তোমাকে—

হেসে বল্লে—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা বাবাঠাকুর, তুমি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করতে আসবা না?

—ওসব কথা আমায বল্‌তে নেই। তুমি আমার নাম মনে রেখেচ যে দেখচি?

—তুমি আমায় মনে রেখেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা মনে রেখেছিলাম। আয়নায় মুখ যে বাবাঠাকুর। যেমন দেখাও তেমনি দেখি।

—একটা গান কর—

ওকে আর দ্বিতীয়বার খোসামোদ করতে হোল না; সেবারকাবের সেই বৃদ্ধাকেও দেখলাম এবার। তাকে ডেকে বল্লে—একতারাটা দ্যাও তো। পতিতপাবন ঠাকুরকে একটা গান শোনাই—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি?

বলে সে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলে।

আমি বল্লাম—কি?

ও একটা আলাভোলা, অসহায় ধরণের অনুরোধ যেন করচে, এমনি ভাবে বল্লে—আমি যেমন তোমায় গান শুনিয়ে গেলাম, তুমি পতিত উদ্ধার করতে এমনি ধারা আসবা তো···বলি হ্যাঁ গা? ও ঠাকুর?···

নাঃ, ও পাগলামি সুরু করেচে আবার। কাকে কি বলে যে!

পাগল ততক্ষণ একতারা বাজিয়ে গান সুরু করে দিয়েচে—

ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।
তোমার সেথা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।
চলার পথে বাদল দিনে তোমার সেই
বাঁশতলাতে দিও ঠাঁই,
ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই...:

সেই ছেলেবেলার শোনা গানটা।...ওর গান গাওয়ার ধরণটা আমার বেশ লাগে। চোখ উল্টে উদাস নেত্রে ওপর পানে চেয়ে—সে ভাবই আলাদা। গলা ভাল নয়, ভাঙা গলা, ভুটো বেসুরো সুর যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসচে—তাই কি, চোখ দিয়ে যখন ওর দরদর জল নেমে এল, তখন আমাদের গ্রামের বিখ্যাত যাত্রার জুড়ি দাসু পরামাণিকের চেয়েও ওকে সুকণ্ঠ বলে মনে হোল।

আরও একটা, তারপর আর একটা। সারাটির চরে ঝিঙেফুল ফুটেছিল সেবার, ঝিঙে ফুলের হলুদক্ষেত আর পাগল ঠাকুরের গানের ।।পাটে সুর একতারে বাঁধা। ধূ ধূ সরাটির চরে, নির্জ্জন সরাটির চরে ঘুলি ঘুলি আব অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলে ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায়? তা হোলে পাগল ঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

আমি এক মনে শুনচি। হঠাৎ গান থামিয়ে ও বল্লে—কি খাবা?

—কিছু না।

—সে বল্লে হবে কেন? আমারে পেরসাদ দেবে এখন কে?

—আমি খেতে আসিনি তোমার কাছে। তোমাকে দেখতে এসেচি। পাঁচ বছর পরে এলাম।

পাগল ঠাকুর বিস্ময়ের সুরে বল্লে—পাঁচ বছর হয়ে গেল এরি মধ্যে? কি জানি, দিন রেতের হিসেব তো রাখিনে। হ্যাঁ, তা তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েচ বাবাঠাকুর। তখন ছিলে এত বড়—ওগো শোনো—

সেই বুড়ী কাছে এসে বল্লে—কি বলচো? খোকাবাবু কে?

আমি বল্লাম—চিনতে পারলে না? সেই এসেছিলাম পাঁচ বছর আগে? নন্দর মাসতুতো ভাই, আমার নাম পতিতপাবন।

—বাবাঠাকুর, বড় খুশি হলাম তুমি এয়েচ। আর চোখে ঠাওর হয় না আগেকার মত। ভালো আছো?

—হ্যাঁ, তা আছি। এখন ইস্কুলে পড়চি—এবার থার্ড ক্লাসে উঠেচি ফাস্ট হয়ে।

—তা হবে। তোমাদের সব ভালো হোক, গুরু গোসাঁইয়ের দয়ায় সব নিরুগী হয়ে থাকো।

পাগল ঠাকুর বল্লে—ঘরে কিছু আছে? বাবাঠাকুরের সেবায় লাগাও।

আমার দুর্ব্বল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেবা লাগানোর কাজে এল একটি পাকা পেঁপে। আমি খাচ্চি, ও হাত পেতে বালকের মত সুরে অথচ নারদ মুনির মত দাড়ি নিয়ে আমার ঠাকুরদাদার বয়সী লোক নিঃসঙ্কোচে বল্লে—দ্যাও একখানা।

দিলাম। যেন আমার সমবয়সী খেলুড়ে। বল্লাম—তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে।

পাগল ঠাকুর হেসে বল্লে—তোমাকেও যে আমার রাখতি ভাল লাগে। থাকবা এখানে?

—ইচ্ছে তো করে। বাড়ীর লোকে থাকতে দেবে না যে।

পাগল ঠাকুর একটা মাটির পাত্র থেকে গুড় তুলে নিয়ে দা-কাটা তামাক মাখলে বসে বসে। একটা কল্কে ভরে তামাক সেজে হাতে করেই টানতে লাগলো। নিজেই একটা হাঁড়ি চড়ালে উঠোনের এক উনুনে।

আমি বল্লাম– হাঁড়িতে কি হবে ?

—বাবাঠাকুর, খিদে পেয়েচে, কিছু খাবো। দুটো চাল দিয়ে যাও গো—

হাঁড়িতে একখুঁচিটাক মোটা বাঙা আউশ চাল ফেলে দিয়ে একটু পরে বড বড় গোটকতক পাকা যজ্ঞিডুমুর সামনের জঙ্গলের থেকে পেড়ে নিয়ে আঠা সুদ্ধুই ফেললে হাঁড়িতে। আমি বসে বসে ওর খাওয়ার মজা দেখচি। ও আবার আমার পাশে এসে তামাক খেতে লাগলো। আমায় বল্লে—বাবাঠাকুর, ওপারের বুনোপাড়া উচ্ছন্নে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে যাই, সারাদিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি, তাই বড্ড খিদে পেয়েচে।

—সেখানে কি কর ?

—আমি কি কিছু করি ? তিনি—গুরু-গোসাঁই করান। যাদের কেউ নেই, আমার অকেজো হাত দিয়ে তিনি তাদের মুখে জল দেন, ওষুদ দেন। আমার হাত ধন্য হয়ে গেল, আমার হাত না নিয়ে অন্য কারো হাত নিলেই পারতেন। তেনার কৃপা।

—গুরু-গোসাঁই কে, আজ বলতে হবে।

—ওই যে উনি—নিরাকার, সব ঘটে আছেন যিনি। তাই তো তুমি আমার পতিতপাবন ঠাকুর। তুমিও যা, তিনিও তা—তোমার মধ্যেই তিনি। যারা রুগী, ওলাউঠোয় বমি করচে, হলদে হয়ে গিয়েচে চোখের শিব, হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরেচে, গলা ঘড়ঘড় করচে—তাদের মধ্যে জনায় জনায় তিনি। তিনি উঁকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে। বেশ দেখতে পাই—বমি ঘাঁটি, ঘেন্না আসে না, মনে হয় গুরু-গোসাঁইয়ের সেবা করচি। খেলা, সব তাঁর খেলা। তাঁর আবার রোগ ! লীলা !

—আমায় নিয়ে যাবে বুনোপাড়ায় ? তোমার সঙ্গে যাবো।

—ওরে বাবা রে ! অমন কচি সুন্দর নতুন হাত বমি ঘাঁটবার জন্যে নয়।

তার এখন দেরী আছে, ও সবের জন্যে তাড়াতাড়ি কি ? পড়ো, এখন খুব মন দিয়ে পড়ো।

একটু পরে ও ভাত নামালে। একটা আঙট কলার পাতে ঢেলে যজ্ঞিডুমুরগুলো টিপে টিপে নুন তেল দিয়ে মাখলে। আমায় বল্লে—কিছু মনে কোরো না বাবাঠাকুর, আমি খাই ? হুকুম করো—

আমার অনুমতির প্রয়োজন কি, বুঝলাম না। তবু বল্লাম—বারে, খাও, আমি কি বলবো ? খাও—শুধু ডুমুর ভাতে ভাত খেতে পারবে ?

—কেন পারবো না, বাবাঠাকুর। একটা যা হয় হোলেই হোল। জিবের সুখ যত বাড়াবে, ততই বাড়ে। ওর মধ্যে কিছু নেই। কে হাট-বাজারে ছোটে ছুটো খাওয়ার জন্যে ? জঙ্গলে গুরু-গোসাঁই সব করে রেখেচেন। ডুমুর আছে, তেলাকুচো ফল আছে—

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—তেলাকুচো ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেলাকুচো ভাতে খাও, ভাজা খাও, তেলাকুচোর পাতা ভাজা খাও—দিব্বি জিনিস। পেয়ারা ভাতে ভাত খেয়ে একমাস কাটিয়ে দিই। উঠোনে ওই ছাখো পেয়ারা গাছ। পেয়ারা হয়নি, তা'হলে তোমায় দিতাম। কেন যাবো বলো হাটে-বাজারে ?

- তোমার উঠোনে তরি-তরকারি কর না কেন ?

—বড্ড খাটতে হয় ওর পেছনে। ঝঞ্ঝাট। কে অত ঝঞ্ঝাট করে ? সে সময়টা গুরু-গোসাঁইয়ের নাম নিলে কাজ হবে। ওই শসার গাছ করা হয় শুধু গুরু গোসাঁইয়ের সেবার জন্যে।

পাগলঠাকুর খেয়ে উঠে এঁটো পাতা ফেলে দিলে। রাজ্যির কুকুর জড়ো হয়েছিল আগে থেকে, পাতের অনেকগুলো ভাত ওদের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

আবার তামাক সাজতে বসলো। তামাক খেতে খেতে বুড়ীকে বল্লে— পাকাটি ছাও গোটাকতক, একটা মশাল করি।

আমি বল্লাম—কি হবে ?

—এখুনি আবার বুনোপাড়ায় যেতে হচ্চে। দুটো রুগী এড়িয়ে আছে, দেখে এসেচি। তাদের ফেলে থাকতে পারবো না। নবীন ডাক্তারকে বলে এসেচি যাবার জন্যে। এখন গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা হোলে সেরে উঠতে পারে। আর তিনি যদি চরণে টানেন—তবে হয়েই গেল—আহা-হা !

ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়লো। আমার হঠাৎ বড় উদ্বেগ হোল ওর জন্যে। ও যেন আমার আত্মীয় কত কালের। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—তুমি যেও না সেখানে। যদি তোমার হয় ? বড় খারাপ রোগ—

পাগল ঠাকুর হেসে বল্লে—ওই দ্যাখো, বাবাঠাকুরের কথা—তাঁর নিয়ে সব। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় এই খোলসটা বদলাবো, তবে তাই হবে। তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্চেন, সেখানে যেতেই হবে। আমি তো যাচ্চি নে, তিনি নিয়ে যাচ্চেন —তাই যাচ্চি। আমি কেউ নই।

একটা অদ্ভুত ভাব ওর মুখে ফুটে উঠলো কথা কটা বলবার সময়। বুড়ী বল্লে—রাত্তিরে ফেরবা তো ?

ও বল্লে—তা বলা যায় না। তুমি ঝাঁপ খুলে রেখো, আমি তো ঝাঁপ খুলে ঢুকবো। চলো বাবাঠাকুর, সন্দে হয়েচে, তোমায় পৌঁছে দিয়ে ওই পথে চলে যাই।

আমি বল্লাম আমায় এগিয়ে দিতে হবে না, একাই যেতে পারবো, কারণ মাসিমা টের পেয়ে যাবেন যে আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। তিনি পছন্দ করবেন না আমার এখানে আসা যাওয়াটা। মনে মনে তা আমি জানি। সুতরাং কথবেলতলা দিয়ে একাই বাড়ী চলে গেলুম। মাসিমাকে পাগল ঠাকুরের কথা কিছু বলিনি। তিনি নিজেই জিগ্যেস করলেন—ওদিকে গিইছিলি নাকি ?

—কোন্ দিকে ?

—পাগল ঠাকুরের আখড়ায় ?

—হ্যাঁ। একটু বসেছিলাম। বেশ ভালো লোক। কোথায় কলেরা হয়েচে, নিজে গিয়ে তাদের সেবা করচে রাত্তির বেলাতে।

—হুঁ।

ঐ পর্য্যন্ত। উনি চুপ করে গেলেন, বুঝলুম না রাগ করলেন কিনা।

তার পরদিন আবার বিকেলে পাগলের আখড়ায় গিয়ে হাজির হই। কিসের একটা টান অনুভব করলাম, না গিয়ে থাকা গেল না।

পাগল ঠাকুর আপন মনে বসে গান করছিল একখানা তালপাতার চেটাই পেতে। ওর গানই ওর উপাসনা, ওর মুখে গান শুনলেই আমার তা মনে হয়েচে। আমার বয়েস কম হোলেও আমি তখন অনেক বুঝি। ওর মত ভক্তি আমি কারো দেখিনি। মাসিমাকে বাড়ী ফিরে কথাটা আমি বলেছিলাম। মাসিমা গীতা নিয়মিত পাঠ করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর বড় প্রিয় ছিল, ব্রত উপবাস করতেন, রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে পূজো-আচ্চা করতেন বেলা ন'টা পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে চন্দন মাখাতেন, ফুল দিতেন। পাগল ঠাকুর ওসব কিছু করে না অথচ সে ভক্ত লোক, এ কথা মাসিমা বুঝবেন না। তবুও মাসিমা মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, শুনে চুপ করলেন।

পাগল ঠাকুরকে বললাম—কখন এলে কাল রাত্তিরে ?

—সারা রাত ছিলাম বাবাঠাকুর। দুটোই মারা গেল, শ্মশানে গেলাম তাদের ভাসিয়ে দিতে।

—পোড়ালে না ?

—গরীব লোকদের পোড়াচ্চে কে বাবাঠাকুর! কাঠকুটো কোথায় ? গুরুগোসাঁইয়ের নামে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলাম—আর ভাবনা কিসের ? দেহটা হাঙ্গর কুমীরে খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হোল। পুড়িয়ে দিয়ে ফল কি, বলো ? ওদের একটা ছেলেকে নিয়ে এলাম আমার এখানে। ওই

শ্যাখো, কাঠ কুড়িয়ে আনচে, ছোট ছেলে, কেউ নেই—গুরুগোসাই তাই আমার ঘাড়েই চাপালেন। তাঁর হুকুম।

ও এমনভাবে কথা বল্‌চে যেন ভগবান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেন সব কথা, আমার হাসি পেল। যা হোক, ওর মন ভারি সরল।

আমাকে ওই পাগল ঠাকুর ভয়ানক বেঁধেচে, ক্রমে বুঝচি। বিকেল হোলে আসতেই হবে যেন ওর এখানে। ও আমাকে কিছু খেতে দেবে, তারপর গান শোনাবে। কোন বৈষয়িক কথা ওর মুখে শুনিনি। অনেক পরে বয়েস হোলে এ সব ভালো করে বুঝেছিলাম।

আমি বল্লাম—তুমি মাছ ধর ?

—না, বাবাঠাকুর।

—তোমার বাড়া কোথায় ছিল ?

অন্য লোক হোলে এ কথার উত্তর দেয় না। কিন্তু পাগল ঠাকুরের মত সরল লোকের কোন কিছুই গোপনীয় নেই। সে বল্লে—শঙ্করপুর। কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে, এখান থেকে আট ন' কোশ।

—বাড়ী-ঘর আছে সেখানে ?

—কিছু নেই। আমরা গরীব লোক, খড়ের কুঁড়ে ছিল, ভেঙে গিয়েচে, ভিটেতে কিছু নেই—মস্ত এক তালগাছ হয়ে আছে, সেবার দেখে এসেছিলাম।

—আপনার জন কেউ নেই ?

—এই যে বাবাঠাকুর, ভুল কথা বলে। আপনার জন নেই কেন, এই তুমিই তো আমার আপনার জন। গুরু-গোসাই সবাইকে আপন করে দিয়েচেন যে! ক'দিন থাকবা ?

—আর দুদিন ছুটি আছে মোট।

—মোটে দু দিন ? তারপর চলে যাবা ? দুঃখু দিতে আসা কেন বলো

তো। তুমি চলে গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে দিন কতক। বিকেলটা কাটবে না। গুরুগোসাঁইয়ের ইচ্ছে।...

বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেই মুহূর্ত্তে ও আমার বড় কাছে এসে পড়লো, আর দূরের লোক রইল না।

বাকি ছদিনও রোজ বিকেলে ওখানে যাই। বুনোদের সেই ছোট ছেলে এরই মধ্যে নিজের হয়ে গিয়েচে। সে দেখি রান্নাঘরে আউশ চালের পান্ত ভাত আর বেগুন পোড়া আপনিই হাঁড়ি থেকে বেড়ে নিচ্চে দিব্যি। নিজের ঘরের মত।

পাগল ঠাকুর আমায় নিয়ে ছোট ঘরের দাওয়ায় বসে আর গান করে। একতারা বাজিয়ে ওর বেসুরো গলায় যখন গান করে, তখন প্রতিদিন এই গঙ্গার চরে যেন কোন বিরাট দেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি...ওদিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের বাঁশবন, ঘোষপাড়ার বাবুদের লিচুবাগান—সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়, সরাটির চরের কাশবনের পেছনে মস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে অস্ত-সূর্য্যের আভায়।

আমার অল্প বয়েস বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, কি অদ্ভুত টান যে হয়ে উঠেছিল পাগল ঠাকুরের ওপর! এখন মনে ভাবলে আশ্চর্য্য হই। বাল্যের সে কয়টি দিনের আনন্দ আর ফিরে পাবো না, তেমন ধরণের আনন্দও আর পাইনি কখনো।

পাগল ঠাকুর গান থামিয়ে একতারা নামিয়ে রেখে একগাল হেসে বল্লে—আনন্দ করো, আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্যেই এই একপাশে পড়ে আছি। গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় শুধু আনন্দ নিয়ে আছি।

ওর হাসিভরা উজ্জ্বল চোখ দু'টি আর নারদের মত সাদা দাড়ি, শিশুর মত সরল মুখ ওর কথার সত্যতা সপ্রমাণ করতো...সেই আনন্দ ছোঁয়াচে রোগের মত পেয়ে বসতো সবাইকে, যে ওর সংস্পর্শে আসতো।

এর একটা উদাহরণ মধ্যে একদিন প্রত্যক্ষ করলাম। কোথা থেকে একদল

মেয়ে-পুরুষ ওর ওখানে এল। বোঁচকা বুঁচকি এক একটা পিঠে বাঁধা। শুনলাম ওরা পাগল ঠাকুরের শিষ্য। ওই যে মাসিমা বলেন, ছোট জেতের গুরু।

কিন্তু গুরুর মত সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করে ওরা দূরে রইল না। সবাই একসঙ্গে বসে তামাক খেলে হাতে হাতে কল্কে পরিবেষণ করে। পাগল ঠাকুরের চারদিকে গোল হয়ে বসে একতারা বাজিয়ে গান করলে, হাসিখুশি, আনন্দ, খাওয়া দাওয়া। ওদের মুখ দেখে মনে হোল জীবনে ওদের কোন দুঃখকষ্ট নেই। খাওয়া দাওয়া তো ভারি, পাগল ঠাকুরের ভাণ্ডার কারো আপন নয়, যার খুশি নিজের হাতে চাল বার করে নিচ্ছে, বুনোপাড়া থেকে দুটো রাঙা শাকের ডাঁটা নিয়ে এল, ডুমুর পাড়লে—চড়ালে ভাত, নুন ছড়িয়ে সবাই আঙট কলার পাতায় ভাত ঢেলে এক সঙ্গে খেলে, গুরুও বাদ গেলেন না। দিনটা আনন্দ করে সন্ধ্যের দিকে সবাই বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে চলে গেল।

আমিও চলে এলাম তার পরের দিন।

এরপরে আবার সে গ্রামে যাই যেবার ম্যাট্রিক পাস দিয়ে কলে. ঢুকেচি। ...মাসিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েচেন, চোখে ভাল দেখতে পান না।

বল্লাম—পাগল ঠাকুর বেঁচে আছে?

মাসিমা বল্লেন—আছে না তো যাবে কোথায়? তোমার বুঝি সেখানে যাওয়া চাইই—আহা-হা, কি যে দেখেচ ওর মধ্যে তুমি! ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি এই কাণ্ড—

পাগল ঠাকুরকে অন্য চোখে দেখলাম। সেই ছোট খড়ের ঘরের আশ্রম, সেই সদানন্দ সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, সব তেমনি আছে। চার বছর আগের মত চেহারাই আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। আমাকে দেখে বল্লে—বাবাঠাকুর যে! আরে, এসো, এসো, তোমার কথা কত বলি। কবে এলে?

—আজই। তুমি ভাল আছ ?

—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপায় আছি ভালোই। বসো, গান শোনবা ?

—গান শোনবার জন্যেই তো আসা।

—শসা খাবা না ছেলেবেলাকাব মত ?

—না, শোনো, এখন আর ছেলেমানুষ নই। তুমি যা খুশি খেতে দিতে পারো, ভাত পর্য্যন্ত। ছেলেমানুষ নই আর, কারো এক্তাজারির মধ্যে নেই এখন। তোমার এখানে খাবো, তাতে দোষ কি ? রাঁধো না তেমনি ডুমুর ভাতে ভাত ?

পাগল ঠাকুর ভযেব ভাণ কবে হেসে বল্লে—ও বাবারে, বাঁওনের জাত মেরে দিই এই সন্দেবেলা। তা হবে না—আব কি খাবা বলো ? ওগো শোনো ইদিকে—এঁকে চেনো ? সেই যে—

বুড়ী কুঁজো হয়ে পড়েচে আরও, চোখেও ভাল দেখে না মনে হোল। কাছে এসে বল্লে—কে ?

—ওই সেই যে ভূপেন বাবুদের বাডীব ছেলেটি কতবড হয়েচে আব কি চমৎকার দেখতে হয়েচে ছাখো। শোনো, দুটো চাল আব কাঁটাল বীচি ভাজা ভেজে নিয়ে এসো তো, খেতে দিই। চা খাও বাবাঠাকুর ? চা করে দিতে পারি। একজন এখানে চা রেখে গিয়েচে, সে মাঝে মাঝে এসে চা খায়। খাবে ?

—করো।

চা করতে গিয়ে ওরা দু'জনে বিষম বিপদে পডলো। বুড়ো-বুড়ী নানা পরামর্শ করে, একবার জল ফোটায়, আবাব নামায়—আধঘণ্টা হয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। কাঁসাব ঘটীতে গবম জল আর চা একসাথে গুড় সহযোগে সিদ্ধ করে অবশেষে এক ব্যাপার করে নিয়ে এল, সবাই মিলে অর্থাৎ তিনজনেই মহা আনন্দে তাই পান করা গেল।

তারপর তামাক সাজতে সাজতে বল্লে—এইবার কি খবর বলো বাবাঠাকুর—

—তোমায় দেখতে এলাম।

—আমায় কি আর দেখতে আসবা? ভালোবাসো তাই; নইলে আমি কি একটা দেখবার মতো লোক?

—জানো, তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হয়?

—সে কি বাবাঠাকুর?

—আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিকার দার্শনিক—ঋষির মত লোক। তোমাকে লোকে চেনে না।

—ওসব কথা আমায় বলো না। আমাকে তিনি পায়ের দাস করে রেখেচেন। তাঁর দয়া। আমার কোন গুণ নেই, বাবাঠাকুর। আনন্দে রেখেচেন, আনন্দে আছি। গান শোনো—

আমার চোখ অনেকটা খুলেচে আগেকার চেয়ে। বৃদ্ধের সরল পবিত্র মুখভাব আর সহজ আনন্দ ও'কে আমার চোখে ঋষির পদবীতে উঠিয়ে দিয়েচে।

পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয় তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু'তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হোলে এই লোকেই উপনিষদ রচনা করতো—সরাটির চরের মত উদার হোত তার বাণী, ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্য্য থাকতো তার ভাষায়, সন্ধ্যেয় সকালে বাঁশবনের পক্ষীকূজনের মত শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকতো তার অঙ্গে অঙ্গে।

কিন্তু এ'কে কেউ চিনলে না।

আমার সারা জীবন ওর দত্ত সহজ আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত। যেবার বিবাহ করি, মাসিমাকে নববধূ দেখাতে গিয়েছিলাম ওঁদের গ্রামে, ভেবেছিলাম পাগল ঠাকুরের ওখানেও নিয়ে যাবো, আসল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই—কিন্তু পাগল ঠাকুরকে আর দেখতে পাইনি।

সেও এক বিকেলে গেলাম ওর আখরাতে। বাবলা গাছের তলায় ওর

সমাধি। ওদের সম্প্রদায়ে নাকি সমাধি দেওয়াই নিয়ম। মাটির একটা লম্বা ঢিবি, বাবলাফুল ঝরে ঝরে পড়েচে তার ওপর। কোনো শিষ্য কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছ রোপণ করে দিয়েচে মাটির ঢিবিটার চারিপাশে—পাগল ঠাকুরের নশ্বরদেহের হাড় ক'খানা ওরই তলায় মাটি মুড়ি দিয়ে আছে।

ওকে এখানকার কেউ চিনলে না। আমার মাসিমা তো এত গীতা পাঠ করেন, মন্ত্র জপ করেন, তিনিই বলেন—হ্যাঁ বাপু, তোমার সেই পাগল ঠাকুব আজ বছর দুই হোল কি তিন হোল মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব ছোট-লোকের খবর রাখিনে. রাখবার সময়ও পাইনে—সেই বুড়ী কেবল বেঁচে আছে আজও। তাকে সন্ধ্যের পিদিম জ্বালতে দেখলাম সমাধির সামনে। রেড়ির তেলের মাটির পিদিম। খড়ের ঘবেব খড উড়ে পড়চে। আখড়ার অবস্থা অতি খারাপ, কারো দৃষ্টি নেই এদিকে মনে হোল। সংসারে এমনিই হয়।

—শেষ—

